1976

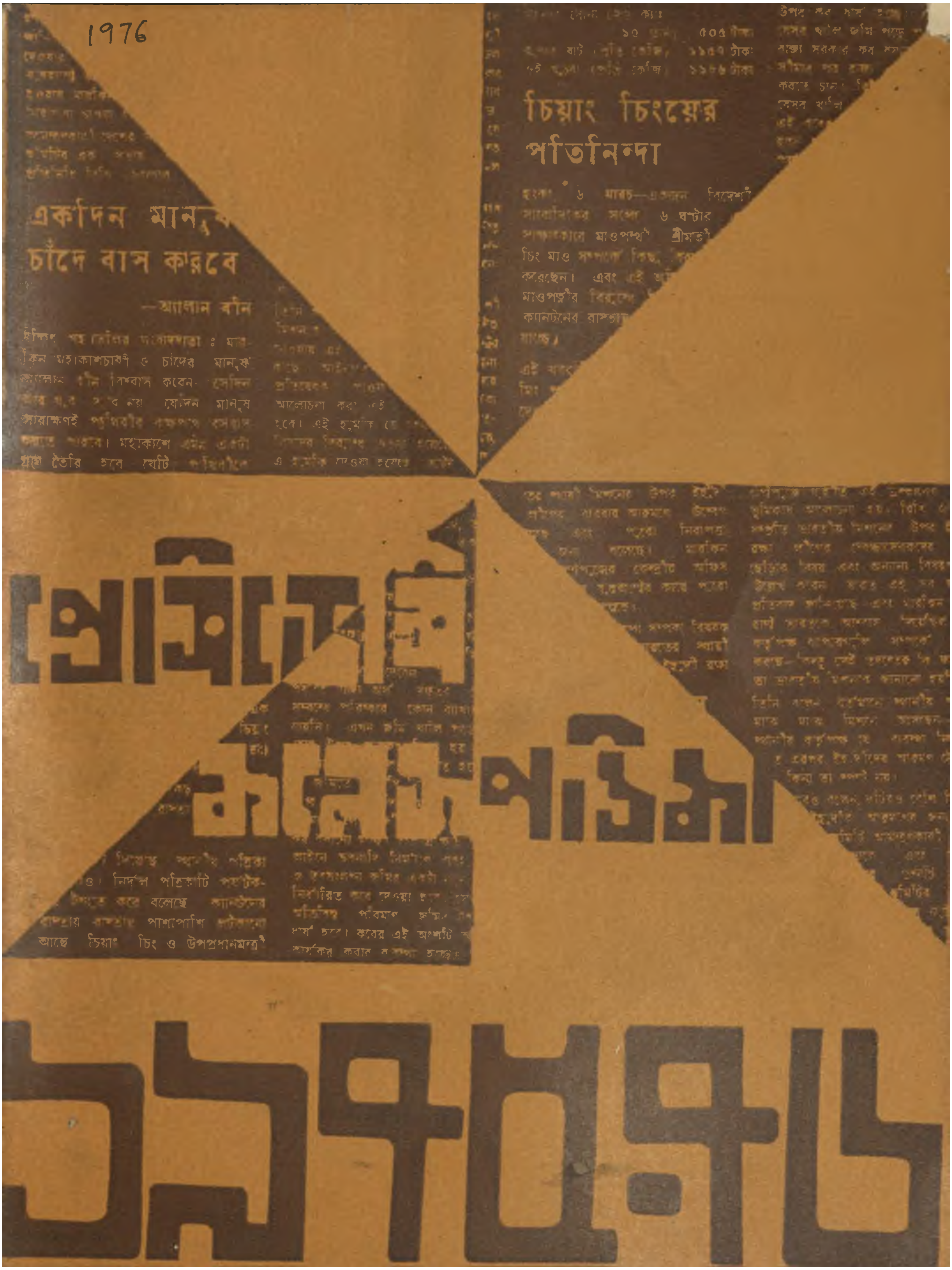
চিয়াং চিংয়ের প্রতিনিন্দা
একদিন মানুষ চাঁদে বাস করবে
—অ্যালান বীন

প্রতিবেশী কবিতা পত্রিকা

১৯৭৫-৭৬

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

দ্বাপঞ্চাশৎ খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

জুলাই, ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
অজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
শংকরনাথ সেন

প্রচ্ছদ শিল্পী

সোমক রায়

Published by the Principal, Presidency College, Calcutta-700073 and Printed at
Neo-Print, 20A, Patuatola Lane, Calcutta-700009

সূচীপত্র

প্রথম যুগের একজন ছোটগল্পকার / পলাশ বরণ পাল ৭
প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্র / বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১১
স্মৃতিতর্পণ / সুবোধকুমার মজুমদার ১৯
হাসনুহানা / স্বাতী রায় ২৪
‘পথের দেবতা’র উৎসসন্ধানে / তপোব্রত ঘোষ ২৯
মৃগতৃষ্ণিকা ইত্যাদি / অরিন্দম চক্রবর্তী ৩৯
বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি / তুষারকান্তি ষন্নিগ্রহী ৪৮
হিতোপদেশের গল্পকার / শংকরনাথ সেন ৫৪
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যেমন দেখেছি / অমিয়কুমার মজুমদার ৫৮
একটি কল্পনা ও একজন কবি / গোপা দত্ত ৬৪
হিন্দু নবজাগরণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী / কমলকুমার ঘটক ৬৯
চলে যাব শৈশব শিকারে / গুঞ্জা সেনগুপ্ত ৭২
ভেবেছিলাম—তুমি আসবে / চিত্রভানু রাহা ৭৩
দানিকেনের বক্তব্য—একটি সম্ভাব্য প্রকল্প / প্রশান্ত শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪
ক্যান্সার / শুভা কর ৭৯
ধূমপান নাই বা করলেন ! / বিশ্বনাথ দাস ৮৫
অনুক্রমণী / সুবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস ৯৪
পরিচিতি ৯৬

Contents

The Inaudible Voice of Black Orhpeus/Gautam Basu 1
The Need to Promote Forestry in India/Pradip Kumar Sanyal 10
On Mathematics and Mathematicians/Gautam Bose 13
The Indian Ocean : A Zone of Peace/Dhruba Jyoti Chakraborty 19
Of You and I : Variation on a Theme/Ananda Lal 24
On the Materialist Historiography of Science/Sumit Ranjan Das 30
The Dawn of Hope/Kavery Bhattacharya 38
The Heritage of Indian Art/Sudakshina Kundu 39
Estimating India's Potential Mineral Resources/A. K. Saha 43
Confessions of an Editor/Shankar Nath Sen 48
Index/Prabodh Krishna Biswas 50
Our Contributors 52
Past Editors and Secretaries 53

FOREWORD

This is the first issue of the College Magazine to appear after the publication of its Diamond Jubilee number. Though it lacks the distinctive character of its predecessor, it has some importance, as with it begins a new chapter in the life of our magazine. It looks forward to what is yet unborn. To set the pace for the next 15 years is its immediate task.

What the College can achieve in the next 15 years is naturally the concern of all to whom the standards of Presidency College are precious. As an organ of the College, the magazine should strive to uphold them. It should also ventilate its views on problems relating to higher education which appears to be in a state of doldrum today and try to secure wide recognition of what Presidency College has done and what it could still do to make the concept of higher learning a reality instead of a pious abstraction. Thus by looking forward instead of looking back at the past, it can serve the College by urging a recognition of the status Presidency College is entitled to, if it is to benefit the community and the country.

P. C. MUKHARJI
Principal
Presidency College

Calcutta, 1976

প্রথম যুগের একজন ছোটগল্পকার

পলাশ বরণ পাল

আমাদের জাতক-পঞ্চতন্ত্র-কথাসরিৎ, মধ্যপ্রাচ্যের আরব্যরজনী-পারস্যরজনী বা সাগরপারের গ্রীস-রোমের পুরাণের কথা স্মরণ রেখেও বলা যায়, ছোটগল্প তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি স্বয়ংনির্ভর শিল্পমাধ্যম হিসেবে বিকশিত হয়েছে রেনেসাঁ-উত্তর কালে। আর বোকাচ্চো-চসার-র‍্যাবলার রচনা থেকে "কাহিনী, চরিত্রায়ণ ও বাগ্‌বিভূতি"—এই তিন প্রধান উপকরণ সংগ্রহ করে কথাসাহিত্য শক্ত পায়ে দাঁড়াল ফরাসী বিপ্লবের পরে। এই প্রথম যুগে আধুনিক ছোটগল্পের অবয়বটি গড়ে তুলেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সের মেরিমে, রাশিয়ার গোগোল-তলস্তয়, আমেরিকার এডগার পো প্রভৃতির ভূমিকা স্মরণীয়। এঁরা সকলেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূলত অন্য পথের পথিক, কিন্তু সাহিত্য-সংসারের এই নবজাতকের প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাতেই এঁরা সমৃদ্ধ করেছেন ছোটগল্পকে। এঁরা তৈরী করেছেন সেই ভিত, যার ওপরে শতাব্দী বদলের সন্ধিক্ষণে গড়ে উঠবে ছোটগল্পের সুরম্য অট্টালিকা, বিচরণ করবেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পকারেরা।

সমসাময়িক আর একজন কিন্তু এ প্রসঙ্গে আরো বেশী করে স্মরণীয় হতে পারতেন। বস্তুত আঙ্গিকে, বক্তব্যে এবং একমুখিতায় ছোটগল্প তাঁর হাতে যেমন ভাবে বিকশিত হয়েছিল তেমনটি আর কারো হাতে নয়। ইতিহাস তাঁকে মনে রেখেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপকথাকারের পরিচয়ে। অথচ ছোটগল্পের ঐতিহাসিকেরা আশ্চর্য ঔদাসিন্যে ভুলে গেছেন তাঁর নাম এবং বিনা কৈফিয়তে বঞ্চিত করেছেন তাঁকে প্রথম যুগের অন্যতম ছোটগল্পকারের মর্যাদা থেকে।

অথচ সে মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য ছিল।

* * * * * *

বলা বোধহয় এখন বাহুল্যমাত্র, আমি বলছি হান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডার্সনের কথা। "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপকথাকার" কথাটি উচ্চারণের সাথেসাথেই এক কথায় তাঁকে চিনে নেওয়া গেছে।

কিন্তু এণ্ডার্সন রূপকথাকার কেন? রূপকথার জগৎ বলতে যে ছায়াঘেরা মায়াবিনী দেশের সংগে আমরা পরিচিত—সেই পরীহুরী, পক্ষীরাজ, ডাইনী বুড়িদের প্রসঙ্গ তো তাঁর গল্পে এসেছে কদাচিৎ। সেই মুষ্টিমেয় অবাস্তবতাকে বাদ দিলে তাঁর বাকি সব চরিত্রই তো আমাদের পরিচিত দৈনন্দিন জগতের বাসিন্দা, আমাদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, বেদনাবিদ্রুপের অংশীদার। যে দরিদ্র চাষির একমাত্র ঘোড়াটিকেও ধনী চাষি মেরে ফেলেছে প্রায় অকারণে, যে মেয়েটি তুষারঝরা শীতের সন্ধ্যায় খালিপায়ে দেশলাই বিক্রি করবার জন্য পথে ঘুরতে ঘুরতে শীতে মারা যাচ্ছে, যে মা মৃত পুত্রকে মৃত্যুদেবতার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য যাত্রা করেছেন সর্বস্ব পণ করে—তারা কেউ কি রূপকথার জগতের বাসিন্দা?

জীবনকে দেখেছিলেন এণ্ডার্সন—এগারো বছর বয়সেই বাবাকে হারিয়ে দারিদ্র্যের জ্বালায় পথে বেরিয়ে বিস্তীর্ণ পরিক্রমার ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চয় করেছিলেন বিচিত্র বিপুল এক জীবনের অভিজ্ঞতা। দেখতে কদাকার, লেখাপড়া হল না, না পারে ভালো গাইতে, না জানে অভিনয়—উপহাসের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠল জীবন। একটা স্কুলে ভর্তি হলেন জনৈক শুভাকাঙ্খীর সহায়তায়, পাশও করলেন। নাটক-উপন্যাস-কবিতা, সব কিছুই লিখতে শুরু করলেন প্রচণ্ড উদ্যমে। খ্যাতির চেয়ে বেশি জুটল বিড়ম্বনা। এরই মধ্যে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনটি গল্প নিয়ে একটি বই বার করে ফেললেন এবং যেন হঠাৎই নিজের লেখার আয়নায় চমকে উঠলেন নিজের ছবি দেখে—আরে! এ তো কুৎসিৎ হাঁস নয়, এ যেন মরাল!

দুঃখের ছবি তাই এণ্ডার্সনের লেখায় ধরা দিল জীবন্ত। তুলির এক-একটি টানে ফুটে উঠল দারিদ্র্যের বাস্তব রূপ। “বাড়ি ফিরতে সাহস হয় না তার, একটা দেশলাইও সে বেচতে পারেনি, একটা পয়সাও সে নিয়ে যেতে পারবে না। বাবা তো ধরে মারবেন—তা ছাড়া, তাদের বাড়ীর মধ্যেও প্রচণ্ড শীত। ঘরের চালে কত যে ফুটো তার অন্ত নেই, তার ভিতর দিয়ে হু-হু-করে ছুরির মত হাওয়া এসে ঢোকে।” অনেক সময় অনেক আপাত-অবাস্তব গল্পেও পড়েছে এই দুঃখভোগের যন্ত্রণার চিহ্ন।

কিন্তু কেবল বেদনার তিক্ততাই নয়, দারিদ্র্যের অসহায়তাই নয়, দুঃখের এই আদিগন্ত তিমিরে যে মঙ্গলআলোক জ্বলে ওঠে, তার সন্ধানও পেয়েছিলেন এণ্ডার্সন। এইখানে তিনি মহৎ জীবন-রসিক। তাঁর একটি গল্পে এক সাধু এসে মৃত্যুপথযাত্রিণীকে সন্ধান দিচ্ছে ওষুধের—এমন গোলাপ যদি পাও যা জন্মেছে স্নিগ্ধ ভালবাসা থেকে, তাকে স্পর্শ করলেই আরোগ্য। কত ফুল এল—এল বসরা থেকে, এল কাশ্মীর থেকে। সন্ন্যাসী বললেন, ওরে ও নয়, এ যে অন্তরের ফুল—হৃদয়ে ফুটবে। কোথায় সেই ফুল? সে কি শিশুর হাসিতে?—না।—সে কি রুগ্ন শিশুক্রোড়ে প্রার্থনারতা মায়ের আকুতিতে? —না।—সে কি কিশোরীর ব্রতপালনে?—না। না, না, না—তবে কোথায় সে গোলাপ? শিশুর হাসি, কিশোরীর ব্রতপালন—এর মধ্যে যন্ত্রণা কোথায়? মায়ের প্রার্থনা—সে তো শুধু তাঁর নিজের শিশুর জন্য—

কোথায় সেই ফুল?—ছেলে পড়ে চলে যীশুখ্রীষ্টের কাহিনী—সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য অমৃতমন্ত্র শোনালেন যিনি, ক্রুশকাঠে বেঁধা হল তাঁকে। অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে অনন্ত নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে তিনি বললেন—‘ভগবান, তুমি এদের ক্ষমা কোরো, এরা জানে না এরা কী করছে।’

—ক্রুশকাঠ না রক্তগোলাপ!—রোগিনী সেরে উঠলেন।

এণ্ডার্সনের গল্পও দুঃখের সমুদ্র মন্থন করে তুলে আনা এই রক্তগোলাপ।

* * * * * *

বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং রূপ-বৈচিত্র্যে ছোটগল্পকে আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন এণ্ডার্সন। তাঁর গল্পের চরিত্র যেমন রাজা-উজীর-অমাত্য, দেশলাইওয়ালী-পুতুলনাচিয়ে, হাঁস-গোলাপ-বুলবুল, এমনকি গ্যাসবাতি-ফারগাছ-ভাঙাশিশি; তেমনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনার ঢংটিও কোথাও সরাসরি,

কোথাও ব্যঙ্গাত্মক, কোথাও প্রতীকী, কোথাও বা দার্শনিক ভাবময়তায় মণ্ডিত। বাস্তব ও রোম্যান্টিক—উভয় জগতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার।

তবে ফটোগ্রাফির মত হুবহু বাস্তব এণ্ডার্সনের গল্পে পরিমাণে খুব বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু যতটুকু পাওয়া যায়, তা একেবারে জীবন্ত মনে হয়। এ প্রসঙ্গ আগেই ঈষৎ আলোচিত—ছোট্ট দেশলাইওয়ালী বা ছোট চাষি—বড় চাষির ঝগড়ার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথম গল্পের বাস্তবের করুণ অবস্থা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন গভীর মমতায়, দ্বিতীয়টিতে নির্মল কৌতুকে। এই ধারার উজ্জ্বলতম গল্প সম্ভবত সেই ধোপানীর গল্পটি ঃ—সারাদিন প্রচণ্ড শীতে কোমরজলে কাজ। তাড়ি খেয়েও গরম রাখা যায় না শরীর। ঠাণ্ডায় জ্বরে যখন মারা গেল ধোপাবৌ, তখন পেয়ালার মদে চুমুক দিয়ে মেয়রসাহেব বলেছেন, ছোটলোকের মাত্রাজ্ঞান নেই—অত তাড়ি খেলে মরবেনা ?—কিন্তু জেলার হাকিমও তো ধোপার ছেলে, তাঁর পায়ে হাত দেবার সময় ছোটলোকজ্ঞান কোথায় থাকে ? —গয়লা-বৌয়ের এই অকস্মাৎ প্রশ্নটি গল্পটিকে জলন্ত অঙ্গারের মত দীপ্ত করে তোলে। চমকে ওঠেন মেয়র—ছোটগল্পের এই আদিম যুগে সমাজচেতনার এমন আশ্চর্য বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখে আমরাও কি চমকে উঠি না ?—প্রসঙ্গত বলে রাখি, এণ্ডার্সনের মা ছিলেন ধোপানী।

এরকম অবিকল বাস্তবের চেয়ে বোধহয় এণ্ডার্সনের বেশি পছন্দ ছিল বাস্তবের প্রক্ষেপণ। তাই ব্যঙ্গ এবং রূপকেই তাঁর হাত খুলেছে সবচেয়ে ভাল। 'সম্রাটের নতুন পোশাক' গল্পে সমস্ত পণ্ডিতম্মন্যতাকে, সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের সব দেমাক আর সমাজের সমস্ত ভণ্ডামি, সমস্ত স্তাবকতাকে যে অসাধারণ কৌশলে তিনি নিরাবরণ করে ছেড়েছেন—তাতে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। ব্যঙ্গরচনার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন হিসেবে বোধহয় গ্রহণ করা যেতে পারে গল্পটিকে। স্মরণীয় সেই ছোট্ট গল্পটি, যার প্রথমে একটি মুরগির গা থেকে একটি পালক খসে পড়ল, এবং শেষে দেখা গেল খবরের কাগজে বেরিয়েছে, পাঁচটি মুরগি তাদের গায়ের সব পালক তুলে ফেলে আত্মহত্যা করেছে। এরকম আরো বেশ কিছু গল্পে হান্স এণ্ডার্সনের ব্যঙ্গের চাবুকের দাগ দেখা যায় স্পষ্ট।

কিন্তু এণ্ডার্সন যেখানে সবচেয়ে সার্থক, সে তাঁর প্রতীকী গল্পগুলি। তাঁর সবচেয়ে ভাল গল্পগুলির অনেক কটিই এই গোত্রের। কুৎসিৎ হাঁসের কথা আগেই উল্লেখ করেছি আমরা। এছাড়াও পথের লণ্ঠন, অচল টাকা, ছোট্ট ফারগাছ, গমের দানা ইত্যাদি অসংখ্য রূপক গল্প লিখেছেন এণ্ডার্সন। এই গল্পগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার লোভ সামলাচ্ছি প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির আশংকায়। তবে প্রতীক নির্বাচন সম্পর্কে একটা কথা না বললে অন্যায় হবে। তা হল—প্রতীকের আড়ালে গল্প বলা মানে কিন্তু ঘুরিয়ে নাক দেখানো নয়। সোজা কথাকে বেঁকিয়ে বলা নয়, সোজা কথাকে আরো সোজা করে বলা। যে কথা সাদামাটাভাবে বললে সস্তা উপদেশের মত শোনায়, সেই কথাটিকেই শিল্পমণ্ডিত করে বলা। এই হল প্রতীক, অন্তত ভাল প্রতীকের আদর্শ এই হওয়া উচিৎ। পাঠকের মনে মূল কথাটি গেঁথে দেবার জন্য তাই সার্থক প্রতীক আমাদের অতিপরিচিত জগৎ থেকেই আহরণীয়। এই কথাটি এণ্ডার্সন বড় সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের। তাঁর গল্পে রূপকের আড়ালে যারা রয়েছে, তারা যেমন কাছের মানুষ, রূপকগুলিও তেমনি আমাদের চোখের চারপাশ থেকেই সংগৃহীত। উল্লিখিত গল্পগুলির নামেই এ উক্তির যথার্থ প্রমাণ করবে।

আর সবার ওপরে এণ্ডার্সন কবি। প্রায় কোনো গল্পেই এই পরিচয়টি গোপন করতে

পারেননি তিনি। রূপক গল্পগুলিতে তো বটেই, এমনকি ব্যঙ্গ গল্পেও এই আশ্চর্য কবির সাক্ষাৎ পাই আমরা। আর কতকগুলি গল্প বিশুদ্ধ কবিতার মত অগ্রসর হয়ে কোনো গভীর দার্শনিক প্রশান্তিতে সমাহিত। বটগাছের স্বপ্ন, মায়ের মন, পরশমণি প্রভৃতি গল্প এই শ্রেণীর। আর কাব্যধর্মী গল্পের নিদর্শন হিসেবে 'বুলবুল' বা 'ইডার ফুল'-ও নিশ্চয়ই আমাদের মনে থাকবে বহুদিন।

তাহলে এতক্ষণের আলোচনাতে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা পেলাম। প্রথমত, এণ্ডার্সন কিছু রূপকথা লিখেছেন, কিন্তু সেই সামান্য কটি লেখা বাদে তাঁর গল্পের জগৎ মূলত বাস্তব। জীবনকে দেখেছেন তিনি এবং সেই জীবনকে এঁকেছেন তিনি। দ্বিতীয়ত, বিষয়বৈচিত্র্যে এবং রূপবৈচিত্র্যে এণ্ডার্সন আধুনিক ছোটগল্পের বিপুল সম্ভাবনার পথ তৈরি করে গেছেন। তৃতীয়ত, দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি অমৃতরসসন্ধানী। এককথায়, এণ্ডার্সনের অবদান—বাস্তবতা, বৈচিত্র্য ও আশাবাদ।

ছোটগল্পের সূচনাকারীদের মধ্যে যাঁদের নাম আমরা স্মরণ করি, এ প্রবন্ধের প্রথমাংশে উল্লিখিত হয়েছে যাঁদের নাম, তাঁদের মধ্যে মেরিমেই শুধু এণ্ডার্সনের বয়োজ্যেষ্ঠ—মাত্র দু বছরের। এণ্ডার্সনের প্রথম বই যখন বের হয় (১৮২২), তলস্তয় তখনো জন্মাননি, গোগোল এবং পো দুজনেই তেরো বছরের নাবালকমাত্র। যে ফ্লোব্যারকে কেন্দ্র করে গল্পকারদের বর্ণাঢ্য পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, মপাসাঁ—তুর্গেনিভ প্রমুখদের গুরু যিনি, সেই ফ্লোব্যার তখন এক বছরের শিশু। সেই সময়েই এই মরমী জীবনশিল্পী ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ছোট গল্পের রাস্তা তৈরি করেছেন, টেল বা নভেলার সংকীর্ণতা থেকে গল্পকে মুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে গল্প শুধু নীতিবাগীশদের বক্তৃতামঞ্চ নয়, শুধু উপন্যাস বা মহাকাব্যের অংশমাত্র, ছোটগল্প একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম—ঋজু, বলিষ্ঠ, নাতিদীর্ঘ। ব্যঙ্গ-রূপক-কাব্যময়তা দিয়ে মুড়ে দেখিয়েছেন বিভিন্ন রূপে কী বিচিত্র অনুভূতির সার্থক বাহন হতে পারে ছোট্টগল্প। জীবনজিজ্ঞাসাকে এ করে তুলতে পারে জ্বলন্ত। অসংগতিকে হাস্যকর। সাদা কথাকে শিল্পময়। মাধুর্যকে সংগীত।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করেই উপসংহার টানা যাক।—পরশমণির সন্ধানে বহু দিন বহু দেশ ঘুরে অবশেষে অন্ধ মেয়ে ঘরে ফিরে জ্ঞানী পিতার হাতে দিল একমুষ্টি ধুলো। "জ্ঞানী বললেন, এ যে ধুলো! অন্ধ বলে—এরই মাঝে পরশমণি লুকোনো আছে।—একটা দমকা হাওয়ায় ধুলো ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। জ্ঞানী বললেন, সব যে উড়ে গেল। অন্ধ বলে—যাক্, ওই ধুলোর মাঝে পরশমণি আছে। ওই ধুলোর ওপর দিয়ে চলতে চলতেই মানুষের জীবনের মহত্ব ফুটে ওঠে। শুধু ভগবানে বিশ্বাস রেখে চলতে হবে।…ওই ধুলোই হল পরশমণি। ওর স্পর্শেই মানুষ দেবতা হয়।"

গল্পটির সৌন্দর্য এতে কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু এর চেয়ে সরল সুন্দর সত্য আর কটি আছে? এণ্ডার্সন নিজেও তো এই ধূলিপথেরই পথিক, এই ধুলোর ওপর চলতে চলতেই তিনি একদিন খুঁজে পেয়েছিলেন নিজেকে। বাস্তব জীবনের পতনঅভ্যুদয় বন্ধুর পন্থাতেই তো তিনি অক্লান্ত যাত্রী।

নাকি এ ছোট গল্পেরই আন্তরসত্য? এণ্ডার্সন নির্দেশিত ছোটগল্পও তো এই ধুলোরই ধন—তুচ্ছাদপি তুচ্ছের মধ্যে সে সন্ধান করে গভীরতম সত্যকে, অণোরপি অণীয়ানের দর্পনে দেখে নিখিল-বিশ্বের প্রতিবিম্ব।

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

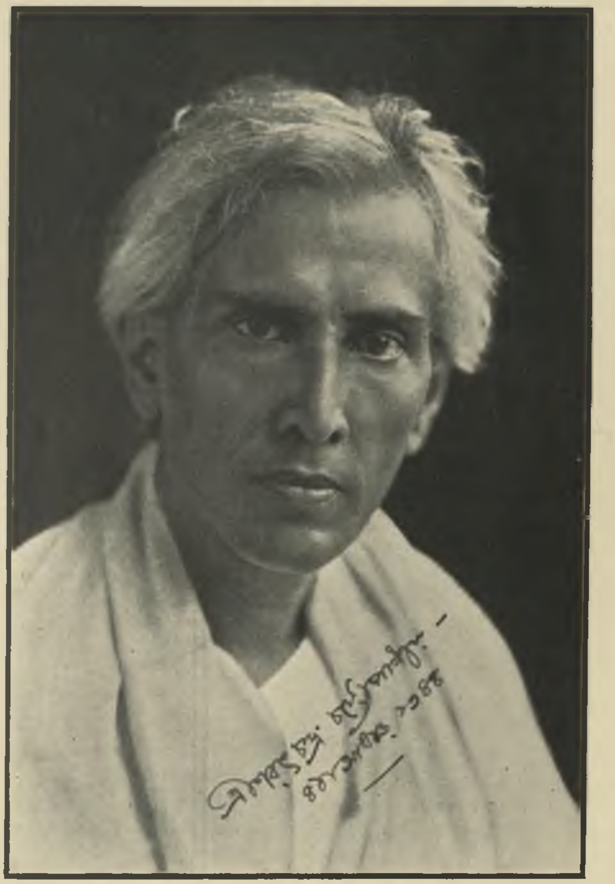
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪৪

"আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরানো জিনিসটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না।……আমার মনে হয়—মেরামত করে জিনিসটা ভাল হয় না। যা আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়। যেটা খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার করে আবার দাঁড় করান উচিত নয়। আমি বলি—মেরামত নয়—ঐটিকেই বাদ দাও।"

প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্র

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

‘আমার আয়ুষ্কালের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যে পরে পরে তিনটে পর্ব দেখা দিয়েছে। আমি যখন আসরের জাজিমটার এক ধারে জায়গা করে নিয়েছিলুম, তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিংহাসনে, মধুসূদন বিদায় নিয়ে গেছেন। এঁরা চলে যাবার কিছু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের সুরু হয়েছিল। প্রথম পর্বে আমি ছিলুম সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো।……তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হয়েছে শরৎকে দিয়ে।’

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই কথা কয়টি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো ভালো লেখা নেই, এই বলে যাঁরা আক্ষেপ করে থাকেন, তাঁদের কাছে, আশা করা যায়, এই প্রবন্ধটি প্রীতিপ্রদ হবে। প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু এই দর্পণে শরৎচন্দ্রকে পুরোপুরি ধরে ফেলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যে ব্যবধান আমরা দেখতে পাই, সে ব্যবধান কেবল সময়ের নয়, এমন কী পরিবর্তিত সমাজেরও নয়, এ ব্যবধান মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গীর। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার পিছনে যে প্রেরণা ছিল, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে শরৎচন্দ্রের বেলায় ঠিক তা’ ছিল না। আবার বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবধানও অনেক বেশি। শরৎচন্দ্রের সমকালকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন এবং সমকালের সঙ্গে মিশিয়ে শরৎচন্দ্রের উদ্যোগকে বিশিষ্টতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে, তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটেনি, তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের ও কালের।’

নিজের দেশের ও কালের কাছে একান্ত অনুগত থেকে শরৎচন্দ্র কী ভাবে চিরায়ত হয়ে উঠেছেন, আমাদের মনে হয় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সেটাই হল প্রকৃত অনুসন্ধানের ব্যাপার। কেননা, বাঙলা-সাহিত্যে তাঁর আগে যারা উপন্যাস লিখেছেন, তাঁদের কেউই এপথে হাঁটেননি। না বঙ্কিমচন্দ্র, না রবীন্দ্রনাথ। গৌণ কথা সাহিত্যিকদের কথা না তোলাই ভালো। কেননা, এঁরা কেউই শরৎচন্দ্রের মত দেশ-কালের অনুগত নন। আর এই শরৎচন্দ্রের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ তো পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন, ‘তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটেনি’।

তা’হলে এই পূর্ববর্তীদের বেলায় ঠিক কী রকম ঘটনা ঘটেছে, সে ব্যাপারে একটু খবর নেওয়া দরকার। কেননা, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কোনো সাহিত্যিকের জন্ম হতে পারে না। সুতরাং শরৎচন্দ্রেরও তা’ হয়নি। ঐ যোগসূত্র কতখানি রয়েছে এবং কতখানি ছিঁড়ে তিনি বেরিয়ে এসেছেন, সেটুকুই প্রথমে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যেতে পারে।

বাঙলা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে যে উপন্যাস-সাহিত্যের সূচনা ঘটেছে, একথা নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। সন-তারিখের নিরিখে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আমরা বাঙলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন গণনা করে থাকি। কেননা, এই তারিখটি হল, 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশের তারিখ। 'দুর্গেশনন্দিনী'র জন্ম আর শরৎচন্দ্রের জন্মের ব্যবধান মাত্র এগারো বছরের। অর্থাৎ ঐ উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার এগারো বছর পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হলেন শরৎচন্দ্র।

ঠিক এই সময়ে হিসাব করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তখন ষোলো বছরের এক তরুণ যুবক। যদিও এই সময় থেকে আরো সাত বছর পরে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' লিখিত হয়, কিন্তু একথা অজানা নয় যে ষোলো বছর বয়সে পৌঁছুনোর আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভালোই কবিতা লিখতে পারতেন। বাঙলা-সাহিত্যের আসরে সেদিন যে জাজিমটা পাতা ছিল, তার এক ধারে রবীন্দ্রনাথ একটা জায়গাও নিয়েছিলেন করে। সুতরাং তারিখ সালের এই ব্যাপারগুলি মিলিয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বাঙলা উপন্যাসের বয়স যখন এগারো, ঠিক সেই সয়মটিতে মতিলাল চাটুজ্যের পুত্রের জন্ম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।—এদিকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেহরক্ষা করেন, শরৎচন্দ্র তখন আঠারো-উনিশ বছরের তরুণ যুবক। দেবানন্দপুর ছেড়ে চলে গিয়েছেন মাতুলালয় ভাগলপুরে। 'এন্ট্রানস্' পরীক্ষা দিয়েছেন। আর সাহিত্যের নেশা তখন তাঁর মনে ভালোই ধরে গিয়েছে, কেননা, 'কাশীনাথ' প্রমুখ কয়েকটি লেখা তাঁর তখন সমাপ্ত। অবশ্য তাঁর এই লেখাগুলি প্রচারিত ও প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়নি। সে সুযোগ পেলে দেখা যেত শরৎচন্দ্রের লেখা হয়'ত বঙ্কিমচন্দ্রও পড়ে ফেলতেন।

কিন্তু সে অঘটন ঘটল না। শরৎচন্দ্র যেমন আড়ালে ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই রয়ে গেলেন অন্তরালে। অন্ততঃ আরো উনিশ বছর তাঁকে ঐ ভাবে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হল। আর রবীন্দ্রনাথ কথিত সাহিত্যের 'দ্বিতীয় পর্ব'টা অতিবাহিত হল ঠিক এই সময়টিতেই। তবে এই সময় সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে উদাসীন ছিলেন না, এ প্রমাণও রয়েছে। শরৎচন্দ্র নিজেই এ সময়ের স্মৃতিতে লিখেছেন, 'বোধহয় সতের বৎসর সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা অকেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। আঠার বৎসর পরে (অর্থাৎ বয়স যখন ৩৫।৩৬) একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব-দুর্ঘটনার মত। আমার গুটি কয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক-পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠানোর কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা আমি তাঁদের নব প্রকাশিত 'যমুনা'র জন্যে একটি ছোটগল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাঙলার পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম, তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিত লিখে আসছি।'

এখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর আয়ুষ্কালে যে তিনটি পর্বের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তারিখ-সনের নিরিখে এবং উপন্যাসের ব্যাপারে কী রকম তা' হতে পারে তার একটা আন্দাজ পাওয়া গেল। এবং মোটামুটিভাবে এটুকুও বোঝা যাচ্ছে যে এই তিনটি পর্বের তিনজন হলেন নায়ক। কেবল নায়ক নয়, যথার্থ

অর্থে ঐ তিনজনকে নিয়ামকও বলা যেতে পারে। —আর ঐ তিনজন হলেন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র। প্রথম দু'জনকে পেরিয়ে তবে পাওয়া গেল শরৎচন্দ্রকে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের অসামান্যতা বিচার করতে হলে ঐ দু'জনের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের প্রেরণার উৎস কী, তার একটু খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার।

যদিও সাহিত্যের ফারাক অনেকখানি, কিন্তু সময়ের ব্যবধান যে খুব একটা বেশি নয়, তা' বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্রের দিকে যাত্রা করলেই উপলব্ধি করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব কী সাংঘাতিক ছিল, তার উত্তাপ প্রথম যৌবনেই অনুভব করেছিলেন শরৎচন্দ্র। এবং এ ব্যাপারে তরুণ শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তিটি মনে রাখবার মতন, '…খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এরপরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতে পারতাম না, পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়; লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একবারে ব্যর্থ হয়েছে।'

'জীবনস্মৃতি'তে, বঙ্কিমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।'—এই রাজতিলক পরানো সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকেও যে একটু চড়া সুরে উঁচু পর্দায় বেধে রেখেছিলেন, একথা বিস্তারিত করে বলা বাহুল্যমাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস লেখবার পটভূমি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার এদেশের পরিবেশ। রেনেসাঁসের প্রভাব তখন দুর্বার। পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে আমাদের এই পূর্বদেশীয় সভ্যতার মিলনের ফলে, সেদিন আমাদের মধ্যে জন্ম হচ্ছে এক নতুন চেতনার। মধ্যযুগের ধর্মের সঙ্কীর্ণতাকে নির্মূল করে আমরা সেদিন বৃত হয়েছি মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার নির্মল বাতাস বইয়ে দিতে। মানবিক সত্যকে আমাদের ভেতর প্রতিষ্ঠিত করাই যে সেদিন মূল লক্ষ্য ছিল, একথা বিবৃত করা বাহুল্যমাত্র। যাই হোক, ঐ বিশ্বাস ও ঐ পরিবেশের ভেতর দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের কেটেছে কৈশোর ও যৌবন। সহমরণ থেকে বিধবাবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা থেকে বহুবিবাহ-জনিত সপত্নী সমস্যার জটিলতা তিনি দেখেছেন চোখের ওপর। ঐ সব বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করবার ব্যাপারে সবাই সেদিন ব্যস্ত। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দীনবন্ধু থেকে মধুসূদন-বঙ্কিম প্রমুখ সকল শিল্পীই এ ব্যাপারে ছিলেন নিমগ্ন। মানুষের বাহ্যিক সমস্যা নিয়ে তাঁরা এতই ব্যস্ত ছিলেন যে মানুষের হৃদয়গত অনুভূতি বা সমস্যার কথা ভাববার মত অবকাশ তেমন তাঁরা পাননি। একজন মানুষের ভেতর যে আরেকজন মানুষকে আবিষ্কার করা যায়, বা নিজের হৃদয়-অরণ্যে মানুষ যে নিজেই পথ হারিয়ে ফেলে, এরকম করে মানুষের কথা অনেকেই সেদিন ভাবতে পারেননি। অন্ততঃ এরকম সূক্ষ্মরহস্য রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ভূদেব-অক্ষয়কে ভাবায়নি। মধুসূদন যে এব্যাপারে ভাবিত ছিলেন, তাও বলা যায় না। তবে গোল বাধল বঙ্কিম এসে। ঠিক প্রথমে নয়, ধীরে ধীরে বঙ্কিম আবিষ্কার করলেন ঐ জটিল মানুষকে। আর ঐ আবিষ্কারের দিন থেকেই বলা যায়, প্রকৃত বাঙলা-উপন্যাসের সূচনা। বলার অপেক্ষা রাখে না, বঙ্কিমচন্দ্রই হলেন এই পথের প্রথম পথিক।—প্রথম লেখক।

তবে একথাও প্রথমে বলে নেওয়া ভালো, বঙ্কিমের পথটা ছিল একটু অন্যরকম। অন্ততঃ ঠিক রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মতন নয়। নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ যেমন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাঁর প্রথম উপন্যাসের নায়ক হয়েছিল, বঙ্কিমও ঠিক অনুরূপভাবে উপন্যাসের ঘোড়ায় চেপে সোজা এসে প্রবেশ করলেন সাহিত্যের খাস তালুকে। সেদিন আমাদের দেশের আকাশে বাতাসে উড়ছে ইউরোপীয় ভাবনা। সুতরাং ঐ তরুণ অশ্বারোহীর অশ্বারোহণের ট্রেনিংটা ইউরোপীয় রীতিতে যে নেওয়া হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! মধুসূদন ইউরোপীয় আদলে লিখেছিলেন প্রথম সার্থক নাটক। তিনি আরো যা লিখেছিলেন, তা'হল মহাকাব্য-ট্রাজেডি-সনেট। এমন কী কবিতার ভাষাটা পর্যন্ত তিনি দেশীয় রাখেননি। ইউরোপ থেকে নতুন ছন্দ আমদানি করেছিলেন, তার নাম 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স'। এই ভাষার নতুন নামকরণ করেছিলেন, 'অমিত্রাক্ষর'। মোটকথা, এই নতুন রীতির মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর সকল সার্থক লেখাই লিখে গেছেন।—জিজ্ঞাসা দেখা দিতে পারে, ঐ বিলেতি উপকরণ দিয়ে যাদের কথা লিখলেন, তারা কী এদেশীয়?—না, ওদেশের? চট্ করে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। তবে একথা আমাদের অজ্ঞাত নয় যে, মধুসূদনের আঁকা রাম-লক্ষ্মণ প্রমুখ চরিত্র জটা-বল্কল পরে যতই এদেশীয় হোক-না-কেন, কোনো কোনো সমালোচক ওঁদের বনবাসের পোশাকের তলায় ইউরোপের কোট-প্যান্‌টালুন দেখতে পেয়েছেন। অর্থাৎ চরিত্রের দিক থেকে এরা যে পুরোপুরি ভারতীয় নয়, এ হল তারই ইঙ্গিত।

মধুসূদনের মতন নানা শাখায় হাত দেননি বঙ্কিম। তিনি কেবল একটি শাখায় হাত দিয়েছিলেন, যেটায় মধুসূদন দেননি এবং সেই শাখাটির নাম হল উপন্যাস! আঠারো শ পঁয়ষট্টিতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি এই উপন্যাস লিখতে, শেষ করেন ১৮৮৭-তে 'সীতারাম' উপন্যাসটিকে গ্রন্থ-আকারে প্রকাশ করে। অশ্বারোহী পুরুষের 'রোমান্‌স' দিয়ে তিনি আরম্ভ করেছিলেন উপন্যাস লেখা, কিন্তু তিনি শেষ করেছেন রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ নামক দুই অখ্যাত বাঙালীকে দিয়ে। 'সীতারামে'র উপসংহারে লিখেছেন, 'রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণে গ্রন্থ সমাপন করি।'—তিন দশকেরও বেশি বঙ্কিমের যে সাহিত্যচর্চা, সেখানে ঐ সূচনা ও এই সমাপ্তির বৃত্তটি কীভাবে মিলে গেছে, তা' পাঠক সমাজই ভেবে দেখবেন; তবে স্বীকার করতেই হয়, বঙ্কিম যেখানে আরম্ভ করেছিলেন, সেখান থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসে তাঁর সাহিত্য-জীবন শেষ করেছেন। রোমান্‌সের রাজ্য থেকে টেনে এনে তিনি সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন রামচাঁদ-শ্যামচাঁদের দরজা পর্যন্ত। উপন্যাস-সাহিত্যে এরপরেও যে কিছু করা যায়, সেদিনের কোনো সাহিত্যিকের পক্ষেই তা' ভাবা সম্ভব ছিল না। না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে, না শরৎচন্দ্রের পক্ষে।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত এরকম একটা স্থিতাবস্থাই চলেছিল। 'চোখের বালি' এসে ঐ অবস্থার মূলে নাড়া দিয়ে বাংলা-সাহিত্যের নতুন করে ঘুম ভাঙ্গাল। নতুন যুগের নতুন ইশারা সেদিন ধরা পড়ল। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন তিরিশের কাছাকাছি, অনেকগুলি উপন্যাস তখন তিনি লিখে ফেলেছেন; 'চোখের বালি' সেদিন তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে এলো নতুন আলো, এবং এর ভেতর দিয়ে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র নিজেরও এক নতুন পরিচয় পেয়ে গেলেন। আবিষ্কার করলেন নিজেকে। এদিনের স্মৃতিতে লিখলেন, 'ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা

নতুন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সেদিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন পরিচয় পেলাম।'—বলার অপেক্ষা রাখে না, এই নতুন উপলব্ধি ও নতুন ধারার পথ ধরেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। অর্থাৎ নিজের প্রতিভা পরিস্ফুটনে কোন্ বিষয়টি তাঁর প্রতিভার উপযোগী হবে, এ হল তারই ইশারা।—সময়ের বিচারে 'চোখের বালি'র গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশকাল হল, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ঔপন্যাসিক হিসাবে যে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যায়, 'সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো।'—ঔপন্যাসিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব আরো দশ বছর পরে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আধিপত্যের কাল আরো দশ বছর যে প্রসারিত হয়েছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। এই দশ বছরের ভেতর প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর আরো কয়েকটা উপন্যাস, ছোটগল্প ও ছিন্নপত্র জাতীয় কিছু চিঠি। এদের ভেতর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল, 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'।—শরৎচন্দ্র এগুলিকে যে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার স্বীকৃতি নানা জায়গায় আছে। এবং এ ব্যাপারে তাঁর সারকথা হল, 'তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশীবার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস—তাঁর 'চোখের বালি', তাঁর 'গোরা', তাঁর 'পত্রগুচ্ছ'। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভালো বলে, সে তাঁর জন্য।'

সাহিত্যের গভীরে ঢুকে মানুষকে কী ভাবে উন্মোচিত করতে হয়, এই শিক্ষাটা রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখলেও, এবং মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে স্বীকৃতি দিলেও বলে রাখা দরকার, জীবনের পাঠটি কিন্তু শরৎচন্দ্র নিয়েছিলেন নিজের মত করেই। আর এ ব্যাপারে তিনি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সকলের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। বা আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের মতন সামাজিক অভিজ্ঞতা, এপর্যন্ত কারোর ঘটেছে বলে জানা যায়নি। আর এ অভিজ্ঞতা কেবল পরবর্তী জীবনে নয়, এ অভিজ্ঞতা, ছিল একবারে আজন্ম, অর্থাৎ ছেলেবেলা থেকে। এ প্রসঙ্গে লেখক নিজেই কবুল করেছেন, 'ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙ্গা ঠেলে, নৌকা বয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি,······একদিন ক্ষত-বিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন।······আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন—সংবর্ধনার ঘটা—এমনি করে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল।'—বেপরোয়া জীবনের প্রতি অনুরাগ শরৎচন্দ্রকে যে বার বার ঘর ছাড়া করেছে, তার উদাহরণ প্রচুর আছে। শান্তশিষ্ট নির্বিরোধ সাদামাটা জীবন শরৎচন্দ্র কোনোদিনই গ্রহণ করতে পারেননি। কখনো দেখা যায় তিনি সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছেন, আবার কখনো দেখা যায় একটি স্টেটের ম্যানেজার-এর সহকারী হিসাবে প্রমোদে দিয়েছেন গা ঢেলে আবার কখনো বা সুদূর বর্মায় গিয়ে স্মাগ্‌লারদের সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না, অনুমান নয়, এ ব্যাপারে লেখকের নিজস্ব স্বীকারোক্তি রয়েছে। এই স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, 'আমাদের বংশে আটপুরুষ ধরে একজন করে সন্ন্যাসী হয়ে আসছে। আমার মেজভাই সন্ন্যাসী। আমিও খুব···এমন কি চার-পাঁচ বার সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেরিয়েছি। ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করে থাকেন—অর্থাৎ

গঞ্জিকা সেবনাদি—তা অনেক করেছি।’—কেবল অনাসক্ত সন্ন্যাস জীবনে নয়, মাঝে মাঝে রাজ-রাজড়ার সান্নিধ্য এবং নাচগানের মজলিসেও দেখা গেল তাঁকে।—‘আমি কিছুদিন বনেলী স্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চলছে।……ডাঙ্গার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হতো। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে নাচগানের মজলিস দিতেন।’—শরৎচন্দ্রের বেপরোয়া জীবনের আরো খবর আছে, এবং সে খবর হল এই রকম ঃ ‘পেটের দায়ে চলে গেলাম নানাদিকে। প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা তাই থেকে, তবে সুকৃতি ছিল, ওর মধ্যে একেবারে ডুবে পড়ি না। দেখ্‌তে থাকতাম সমস্ত খুঁটিনাটি, খুঁজে বেড়াতাম। অভিজ্ঞতা জমা হত। সমস্ত Island গুলো (বর্মা, জাভা, বোর্নিয়ো) ঘুরে বেড়াতাম।’ —এই সামাজিক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি একথাও শরৎচন্দ্র লিখেছেন,‘ বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্যে এগজামিন দিতে পাইনি। এমন দিনও গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্য জ্বর করে দাও তাহলে দু-বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস করেই দিন কাটবে।’

যে লেখকের জীবনে এমন বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল, বিচিত্র মানুষকে যিনি খুব কাছের থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি যদি বলে ওঠেন, ‘বাড়ীতে ব’সে আর্ম-চেয়ারে ব’সে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না’, আশা করি একথা তাঁর ব্যাপারে অন্ততঃ নিতান্ত অতিশয়োক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের এই কথা যে শরৎচন্দ্রেই সাজে, তার প্রমাণ হল, তাঁর বিপুল সাহিত্য। শরৎচন্দ্রের নিজের কথা হল এই যে তিনি কখনো তাঁর সাহিত্যে অকারণ ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেননি। দু চোখে যা দেখেছেন, এবং দু কানে যা শুনেছেন এবং অন্তরের ভেতরে যা উপলব্ধি করেছেন সত্য বলে, তাকেই দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের ভেতরে স্থান করে। এই অভিজ্ঞতাই ছিল লেখকের একমাত্র সম্বল যা অবলম্বন করে লেখক শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর আশ্চর্য সাহিত্য। তিনি নিজেও কবুল করেছেন, ‘রূপের বর্ণনা, স্বভাবের বর্ণনা আমার বইয়ের মধ্যে নেই। ও আমি দু-এক কথায় সেরে দিই, বেশী নজর দিই না। আসল বস্তু, তার সত্তা বা মন যাহাই বলুন—সেটা মানুষের ভিতরটা। সেইটা উপলব্ধি করবার জন্য চাই প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা।……আমার চরিত্রগুলির 90% basis সত্য।’

সাহিত্য সৃষ্টির মূল উপকরণ যে সত্য এবং অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই যে তাকে লেখকেরা আবিষ্কার করে থাকেন, একথা শরৎচন্দ্র কেন, দেশ-বিদেশের তাবৎ লেখক কুলই তা’ জানেন। সুতরাং জিজ্ঞাসা দেখা দিতে পারে, এখানে শরৎচন্দ্র কী আর নতুন কথা বললেন ?—না, শরৎচন্দ্র নতুন কথা কিছু বলেননি, তবে এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তিনি যা করেছেন, তা’ হল তিনি তাঁর পুঁজি বা সম্বলটিকে আমাদের কাছে খুলে দেখিয়েছেন। শেক্‌সপীয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে টলস্টয় প্রমুখ মনীষী সাহিত্যিকদের প্রতিভা ছিল অনেক বড়ো, এঁদের সাহিত্য রচনার উপকরণ ছিল কেবল অভিজ্ঞতা নয়, ছিল মনীষা, বৈদগ্ধ্য, অসাধারণ কল্পনাশক্তি, এবং কারো কারো বা বহুপঠনে পরিশীলিত চিত্ত ও ঐতিহ্যবোধ। এছাড়া আরো অনেক গুণ থাকতে পারে যা সাহিত্যিকদের করে তোলে অসাধারণ ও বিশিষ্ট।—না, এর অনেকগুলিই শরৎচন্দ্রের ভেতর ছিল না। তবু শরৎচন্দ্র একজন বড়ো লেখক হতে পেরেছেন, এইটুকুই হল শরৎচন্দ্রের বিশিষ্টতা ও অনন্যতা।

আলোচনার সূচনাতেই এসেছে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথা। এঁদের মনীষা, কল্পনাশক্তি ও পঠন-পাঠন যে-রকম ছিল, তার অনেকখানিই যে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মাধ্যমে অন্বিত ছিল না, এ কথা অনেকেরই জানা। কল্পনার কথা আগেই বলা হয়েছে, এবং এ ব্যাপারে তিনি যে বিপরীত প্রান্তের মানুষ তা' সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। আর মনীষার ব্যাপার নিয়ে তিনি কখনোই বড়াই করেননি, মাথাও ঘামাননি। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের খবরাখবর রাখতেন যদিও, পড়েছেনও কিছু কিছু, কিন্তু কখনো যে এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এমন দাবি শরৎচন্দ্র করেছেন বলে শোনা যায়নি। টলস্টয়ের 'রেজারাকসানে'র কথা তাঁকে উল্লেখ করতে দেখা গেছে। আরো যে-সব সাহিত্যিকদের নাম তিনি লিখেছেন, তাঁরা হলেন, অস্টিন, মেরি কোরেলি, সারা গ্রাণ্ড ও চার্লস্ ডিকেন্স। তবে রেঙ্গুন-প্রবাসের উল্লেখ করে তাঁর পড়াশোনার কথা যা বলেছেন, সেটাই হল শেষ কথা, 'পড়িয়াছি বিস্তর।·········Physiology, Biology and Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।'—জিজ্ঞাসা দেখা দেওয়া অযৌক্তিক নয়, এ জাতীয় পড়শোনা কী সাহিত্যিকদের পক্ষে অপরিহার্য?—না কী সাহিত্যের বই পড়ে সাহিত্য করবার ইচ্ছা নেই বা ছিল না, এটুকু জানাতেই শরৎচন্দ্রের ঐ সদম্ভ ঘোষণা? সম্ভবতঃ তাই। কেননা, পরে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে জেনেছি, '······concrete রচনা করতে গেলে কল্পনা চলে না, নিজের অভিজ্ঞতা চাই। পরের লেখা সাহিত্য আমি খুব পড়েছি। ও আমার ভাল লাগে না।'

যদিও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র এ জাতীয় নেতিবাচক কথা বলেননি, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে মনোনিবেশ করলে দেখা যায়, বাহ্যতঃ ঐ দুই সাহিত্যিকের প্রভাব তাঁর ওপর থাকলেও, তিনি এঁদের থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যা করেননি, তিনি তাই করেছেন। কেবল 'অভিজ্ঞতা'র ওপর নির্ভর করে সাহিত্য করতে গেছেন বলে, নিজেকে তিনি সর্বতোভাবে সমর্পণ করলেন, 'নিজের দেশের ও কালে'র কাছে। উনিশ শ তেরো খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে 'বড়দিদি', সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভের এক বছর আগেকার সময় থেকে আমাদের দেশের সমাজ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে কী ভাবে বিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের বছর পর্যন্ত চলে এসেছে, তার ছবি ধরে রেখেছেন শরৎচন্দ্র। বাঙলা-উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই যুগটিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তৃতীয় পর্ব'। এবং কবির ভাষাতেই বলতে হয়, 'তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হয়েছে শরৎকে দিয়ে।'

এখন শরৎচন্দ্র ঠিক কী কী করেছেন, প্রতিটি উপন্যাস ধরে তার পরিসংখ্যান না নিয়েও, কয়েকটি কথা অন্ততঃ বাইরে থেকে সহজেই বলা যায়। এদের ভেতর প্রথম কথাটি হল সমাজ সম্পর্কিত। শরৎচন্দ্র যে সময় কলম ধরেছিলেন, সে সময় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এবং নিজের সঙ্গে আরেক নিজের লড়াই চলছিল। সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র এই বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই এই দ্বন্দ্বের ছবি এঁকে বাঙালী পাঠকদের চিত্ত নিয়েছিলেন জয় করে। সমস্যার সমাধান তিনি করেননি, সমস্যাটি কী ভয়ঙ্কর, তা' তিনি তুলে ধরলেন সকলের চোখের সামনে। একথা অপ্রকাশিত নয় যে, গত শতকের শেষ থেকে আমাদের সমাজের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমনের যে ভাঙ্গন আরম্ভ হয়েছিল, ঐ ভাঙ্গাগড়া আজো অব্যাহত। সুতরাং শরৎচন্দ্র তার ছবি এঁকে সকল

মানুষকেই স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, যা আজ আর সম্ভব নয়। কেননা, যে সমাজ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে, তা, খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন এবং অনেকটা ছোট ছোট দ্বীপের মতন। এখন যে সাহিত্যিকই আসুন-না-কেন, তিনি বড়ো জোর কয়েকটি দ্বীপের মত মানুষকে স্পর্শ করবেন, গোটা দেশের মানুষকে নয়। শরৎচন্দ্র কিন্তু দেশ ও কালের গুণে সমকালের সকল মানুষকেই ধরে রাখতে পেরেছিলেন তাঁর সাহিত্যে। এটুকুই তাঁর অনন্যতা। অবশ্য এ অনন্যতা আরো নানা দিকে প্রসারিত।

শরৎচন্দ্রের সব থেকে বড়ো আবিষ্কার হল, একটি মানুষের ভেতর আরেকটি মানুষকে আবিষ্কার করা। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটিকে উপেক্ষণীয় বলে বর্জন করা যায়। কেননা, এ জাতীয় দ্বৈত ব্যক্তিত্বের চিত্র বহু সাহিত্যিকের সাহিত্যের ভেতরই আছে। সুতরাং জিজ্ঞাসা দেখা দিতে পারে, এ আবার নতুন কী ?—না, ব্যাপারটি ঠিক এভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের মধ্যে যা পাওয়া গেল, তা' হল সাধারণ মধ্যবিত্ত ও সাদামাটা মেয়েদের ভেতরেও এই বিরোধের আবিষ্কার। 'দেবদাসে'র পার্বতী থেকে 'স্বামী'র সৌদামিনী প্রমুখ সব নারী চরিত্রই এই বিরোধে ক্ষত-বিক্ষত। বই-পড়া বিদ্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র এঁদের আবিষ্কার করেননি, আবিষ্কার করেছিলেন নিজের 'অভিজ্ঞতা'র ভেতর দিয়ে ; তাই এরা এমনভাবে আশ্চর্য রকম জীবন্ত হতে পেরেছে।

মোট কথা, এই বাস্তব 'অভিজ্ঞতা'ই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের নিয়ামক, তাঁর সাহিত্যের সব রকম খ্যাতির ও সকলের পিছনে আছে দাঁড়িয়ে। এর ফলে, আরো দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন ধরা পড়েছে আমাদের সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে ছিল রাজা-রাজড়া ও জমিদার-সামন্তদের বাড়াবাড়ি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় সমকালীন মানুষদের যে ছবি এঁকেছেন, তা' আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের বলে প্রতীয়মান হলেও, আসলে তারা ছিল অভিজাত শ্রেণীর, সাধারণ নয়। অবশ্য ছোট গল্পের কথা আলাদা, কারণ সেখানে রবীন্দ্রনাথ খুব সাধারণ মানুষদের ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। যাই হোক, ব্যাপকতর অর্থে শরৎচন্দ্রই প্রথম কথা সাহিত্যিক, যিনি সাধারণ মানুষদের অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের ভেতর। ভেতরে-বাইরে যারা খাঁটি বাঙালী সেই বাঙালী সমাজ তাঁদের সব রকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিয়েছেন এখানে। এরা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের চিত্রিত চরিত্র থেকে একেবারে আলাদা। ঠিক এই সূত্রে আরেকটা দিকের সিংহ দরজা খুলে গেল। সাধারণ মানুষরাও সাহিত্যিক হবার মত সাহস পেলেন এই শরৎচন্দ্রকে দেখে। পাণ্ডিত্য নয়, পড়াশোনা নয়, মনীষা বা কল্পনাশক্তির অঢেল ঐশ্বর্যও নয়, শুধুমাত্র 'অভিজ্ঞতা'কে অবলম্বন করে এঁরা নেমে পরলেন সাহিত্য রচনায়। আর সত্যি কথা বলতে কী, এরপর থেকেই বাঙলা উপন্যাসের যথার্থ আধুনিক পর্বের সূচনা ঘটল।

শরৎচন্দ্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা এইখানে। সার্থকতাও। যুগান্তরের নায়ক হিসাবেই শরৎচন্দ্র আমাদের কাছে থাকবেন চিরকাল অমর হয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথের ঐ বিশ্লেষণ যে যথার্থ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার ঠিক এক বছর আগে তিনি উপন্যাসকে যেখানে এনে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ধারা আজো প্রবাহিত। তবে তা' আরো বিস্তৃত এবং আরো অনেক অপরিচিত মানুষের মিছিলে ভরে গেছে, এটুকুই যা তফাৎ।

স্মৃতিতর্পণ

সুবোধকুমার মজুমদার

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ আইনজ্ঞ ও ইতিহাসবেত্তা ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২২শে এপ্রিল পরলোকগমন করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে বিংশ শতকের প্রথম দুই দশককে যদি স্বর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া হয়, তা'হলে এই যুগের সেরা ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন প্রমথনাথ, যাঁর মেধা ও কৃতিত্বের কথা সে যুগে প্রায় কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর তিরোধানে পুরাতন ও নবীনের মধ্যে হঠাৎ সংযোগের সেতুটি বিচ্ছিন্ন হ'ল—একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল সেই সঙ্গে।

নবদ্বীপের নিকট নাখুদা গ্রামে ১৮৯৪ সালে এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার জুডিশিয়াল সার্ভিসের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বদলির চাকরীতে তাঁকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। তার ফলে পুত্র প্রমথনাথ বড় শহরের নামী স্কুলে পড়াশুনা করার তেমন সুযোগ পাননি। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পড়াশুনা করে অবশেষে কাটোয়ার কাশীরাম দাস ইনৃস্টিটিউট থেকে ১৯০৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। পাশ করার পর তিনি কলকাতায় আসেন এবং ভর্তি হন বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯১১ সালে প্রথম বিভাগে তিনি আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তার চেয়েও বেশী কৃতিত্ব দেখান পরবর্তী বি. এ. পরীক্ষায় ইতিহাস অনার্সে প্রথম স্থানটি অধিকার করে। এই সময় যাঁরা তাঁর শিক্ষক ছিলেন তাঁরা সকলেই মফঃস্বল থেকে আগত এই মেধাবী ছাত্রটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইতিহাস বিভাগের প্রধান তখন ওটেন সাহেব। ওটেন লিখেছেন যে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রমথনাথই নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ভারতীয় ছাত্রদের মেধা কত তীক্ষ্ণ হতে পারে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি এই ছাত্রটির নামোল্লেখ করেন ঐতিহাসিক ফিশারের কাছে। ১৯১৩ সালে যাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, নির্মল

সিদ্ধান্ত, প্রভৃতি। অসাধারণ এই ছাত্রদলটি—এঁদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন অন্ততঃ পাঁচজন। ১৯১৫ সালে এম. এ. পরীক্ষায় ইতিহাসে পুনরায় প্রথম স্থানটি অধিকার করলেন প্রমথনাথ। সঙ্গে সঙ্গে আইনের পড়াও চলছিল—সেখানেও সমান কৃতিত্বের অধিকারী হলেন তিনি।

১৯১৮ সালে 'প্রাচীন ভারতে আন্তর্জাতিক আইন' বিষয়ে গবেষণা করে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। গবেষণা কাজে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন আচার্য ব্রজেন শীলের নিকট। এই সময়ে ছাত্র হিসাবে তাঁর মেধার পরিচয় পেয়ে স্যার আশুতোষ তাঁর মধ্যম কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বাংলার সুধীসমাজে অগ্রণী যাঁরা তাঁরা সকলেই এই বিবাহে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বরানুগমন করেন, অনেকের সঙ্গে, প্রমথনাথের ইতিহাসের শিক্ষক অধ্যাপক ওটেন। কট্টর সাহেব হয়েও কলাপাতায় বিয়ের ভোজ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

১৯১৭ থেকে প্রমথনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক ও হাইকোর্টে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী। ১৯২৮-এ তিনি বার-এট-ল হবার জন্য ইংলণ্ডে যান। প্রথম 'বার' পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ফাইনালে চতুর্থ স্থান। কনস্টিটিউশনাল ল-এর পত্রে তিনি একশ'র মধ্যে একশ'ই পেয়েছিলেন। পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক মরগান্। বেশ কিছু বছর পর মরগান্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসে একটি ঘরোয়া মিটিং-এ তৎকালীন উপাচার্য চারু বিশ্বাস মহাশয়কে বলেন, ব্যানার্জী নামক কলকাতাবাসী এক ছাত্রকে তিনি একবার একশ'র মধ্যে একশ'ই দিয়েছিলেন তাঁর পেপারে। ছেলেটি এখন কোথায় এবং কি করে জানতে চাইলে, উপচার্য পাশে উপবিষ্ট প্রমথনাথকে দেখিয়ে দেন। সেদিন সন্ধ্যায় ল কলেজের এক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের ভাষণ দেবার সময় মরগান্ বলেন, "I gave your Principal 100 out of 100, because I could not give him more."

প্রমথনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ছাত্র সম্পাদক। কি ভাবে এই পত্রিকার জন্ম হ'ল তা অনেকবার তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্কালে ছাত্রদের মনে পত্রিকা প্রকাশের বাসনা জাগে। আপাত দৃষ্টিতে নির্দোষ এই ইচ্ছাকে কার্যকারী করতে তখনকার দিনে কতই না কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল! কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথমটা হাঁ বা না কোন কথাই বলেননি, সম্ভবতঃ ছাত্রদের উৎসাহটা কতদূর আন্তরিক সেইটা যাচাই করে দেখতে সময় নিচ্ছিলেন। প্রমথনাথ ও তাঁর সহপাঠী যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার) অধ্যক্ষ জেমসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে কথাবার্তা শুরু করেন। ইতিমধ্যে কোন কিছু সিদ্ধান্ত হবার আগেই শোনা যায় অধ্যক্ষ জেমস্ ফারলো স্বগৃহে প্রত্যাগমন করছেন। যেদিন জেমস্ রওনা হবেন সেদিন দুই বন্ধু মিলে হাওড়ায় গেলেন অধ্যক্ষ মহাশয়কে বিদায় জানাতে। প্রসঙ্গক্রমে পত্রিকার কথা উঠল। সাহেব ছিলেন ছাত্রদরদী এবং যেহেতু তখন তিনি 'সুইট হোমের' স্বপ্ন দেখছেন, তখন বোধ হয় ছাত্রদের তাঁর কিছুই অদেয় ছিল না। প্রতিশ্রুতি দিলেন ছাত্ররা যদি স্বেচ্ছায় পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করতে রাজী থাকে, তা'হলে তিনি ফিরে এসেই পত্রিকার ব্যবস্থা করে দেবেন। সেইমত কথা রেখেছিলেনও।

প্রমথনাথ হলেন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ও যোগেশচন্দ্র সেক্রেটারী। অধ্যক্ষ জেমস্ প্রমথনাথকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন এবং অধ্যক্ষের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না।

প্রমথনাথ ছিলেন অর্দ্ধশতাব্দী ধরে সেনেট-সিণ্ডিকেটের সদস্য ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। ১৯৪৮-৪৯ পর্যন্ত তিনি উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকলেও তাঁর আসল পরিচয়, তিনি একজন আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী। প্রায় ৩০ বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও আইন বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব ও জনপ্রিয়তার কথা সুবিদিত। অধ্যাপনার বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করে, বিবিধ জটিলতার ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে সারাংশ বার বার স্পষ্টোচ্চারিত ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপিত করতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এজন্য পাঠ্য বিষয় বহির্ভূত নানা বিষয়ের অবতারণা করতেন তিনি।

এ ধরনের স্মৃতিচারণে খানিকটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে যেতে বাধ্য, সেজন্য আমি আগেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। ১৯৬৫-তে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার কিছু কালের মধ্যেই কয়েকবার তিনি ছুটি কাটাতে মধুপুরে আসেন। শেষবার আসেন ১৯৬৯-এ। যেহেতু আমিও তখন মধুপুরে —তাই অত্যন্ত নিকট থেকে এই ক'বছর ওঁকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। ওঁর কথা শোনার জন্য ওঁর কাছে প্রতিদিন একবার অন্ততঃ গিয়ে বসতাম। এই লেখাটা যখন লিখছি তখন আমার মানসপটে বার বার তাঁর সহাস্য মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে। রৌদ্রস্নাত পূবের বারান্দায় তিনি একটি বেতের চেয়ারে বসে আছেন, পরিধানে নিশিযাপনের গলাবন্ধ সুতীর কোট, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট—সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটি মানুষের ছবি—যিনি তাঁর কর্মবহুল জীবনে অনেক দেখেছেন, শুনেছেন ও জেনেছেন, এবং এখন তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী কোন এক উত্তরপুরুষকে শোনাতে আগ্রহী। বলতেন, "বৃদ্ধ হয়েছি, পুরানো দিনের কথা বলতে ভাল লাগে এবং মনের মত শ্রোতা পেলে তো কথাই নেই।" ওঁর বাল্যকালের পড়াশুনা, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ও ইংলণ্ডের প্রবাস জীবনের কাহিনী যেমন শুনেছি, তেমনি শুনেছি ইতিহাস-অর্থনীতি সম্পর্কে নানা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। সরস সরল অথচ তথ্যপূর্ণ কথোপকথনে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল বলে মনে হয় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে কথা বলতে পারতেন, স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতেন ইতিহাস ও অর্থনীতি, সাহিত্য ও শিল্পকলার জগতে। ঠিক এ ধরনের পাণ্ডিত্য এযুগে বিরল হয়ে আসছে। আমি যে সময়কার কথা বলছি সে সময় তিনি Colonial History-র ওপর প্রচুর পড়াশুনা করছেন। বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত অনেক বই তাঁর সঙ্গে আসত। এবং খুব দ্রুত পড়ে সেগুলি তিনি শেষ করতেন। রহস্য করে বলতেন, "এত তাড়াতাড়ি পড়ি বলে ভেবো না, না পড়েই পাতা ওল্টাচ্ছি। যে কোন জায়গা থেকে আমাকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পার সত্যি পড়েছি কিনা!" এক-একদিন আফ্রিকার বিদেশী উপনিবেশগুলির ইতিহাস তিনি আদ্যোপান্ত বলে যেতেন। সমস্ত আফ্রিকার মানচিত্র ছিল তাঁর নখদর্পণে এবং কত যে ভৌগলিক খুঁটিনাটি একের পর এক তিনি বলে যেতেন, শুনে অবাক লাগত ; ভাবতাম এই বয়সেও স্মৃতিশক্তি তাঁর কত প্রখর। আমরা, আজকের শিক্ষকেরা, ক্লাশে মানচিত্র ব্যবহারে কত অমনোযোগী তা' তাঁর

অজানা ছিল না, তাই অনুযোগের সুরে বলতেন মানচিত্র ছাড়া ইতিহাস পড়ানো সম্ভব এধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মনে পড়ল গ্রীসের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে অধ্যাপক জ্যাকারায়া একই কথা বলতেন। তিনি ছাত্রদের দিয়ে গ্রীসের মানচিত্রটি কয়েকবার আঁকিয়ে এবং ভৌগলিক নামগুলির সঙ্গে তাদের পরিচিত করিয়ে তারপরই ইতিহাসের পাঠ শুরু করতেন। এই সকালবেলাকার বৈঠকে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম যা আমার মনের আকাশকে আরও প্রসারিত করেছিল। বাইবেলের ইতিহাস যে এত হৃদয়গ্রাহী হতে পারে তা তাঁর কাছেই প্রথম জেনেছিলাম। আমাদের দেশের ক'জন শিক্ষিত ব্যক্তি এই বিষয়টির খোঁজ রাখেন? পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে তিনি এ্যাসিরীয়া ব্যাবিলনের ইতিহাস পড়াতেন, তাই কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই সুদূর অতীতে পশ্চিম এশিয়ার কথা এসে পড়ত। রজেটা স্টোনের পাঠোদ্ধার কাহিনী, বোঘাজকোই ও কারকেমিশের খনন কার্যের বিবরণ ও নিনিভে বা নিমরুদে প্রাপ্ত মর্মর মূর্তিগুলির কথা শুনে প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল।

মুখ্যতঃ ইতিহাস ও আইনের ছাত্র হলেও সাহিত্য-প্রীতি মিশেছিল তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। তাঁর প্রকৃতির মূলে ছিল এক কবিসত্তা; তিনি কবিতা পড়তে ভালবাসতেন, আনন্দ পেতেন আবৃত্তি করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপকদের কাছে তাঁর সাহিত্য পাঠ শুরু হয়েছিল। ঠিক উচ্চারণ শেখার প্রেরণাও তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের কাছে। উচ্চারণ ঠিক না হলে ইংরাজী কবিতা যে পড়াই যায় না, সে কথা বলতেন বার বার। শেক্স্পীয়রের বহু অংশ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, রোমান্টিক কবিদের রচনা থেকেও তিনি অক্লেশে আবৃত্তি করতে পারতেন। একদিন Wordsworth-এর *Ode to Immortality* এবং *Ode to Duty* পুরোটাই আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকে স্মৃতিশক্তি তাঁর খুব প্রখর—একবার দু'বার যা পড়তেন সবই মুখস্থ হয়ে যেত। এ জন্য বিশেষ কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয়নি। কেবল ইংরাজী কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও কালিদাসের শ্লোক অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন। সংস্কৃতে তাঁর পারদর্শিতার কথা স্মরণ করে বাংলার সংস্কৃত পর্ষদ্ তাঁকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি দিয়েছিল।

অধ্যাপনা ও আইনব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে প্রমথনাথ দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে তিনি ১৯৩৬-এ এ্যাসেম্বলীতে নির্বাচিত হন। পরে কিছু কালের জন্য ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় রাজস্ব, বিচার ও খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর আরও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পেলেন তিনি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তিনি একাধিকবার পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট. ও কানাডার ম্যাক্গিল্ বিশ্ববিদ্যালয় এল. এল. ডি. উপাধিতে ভূষিত করে।

প্রমথনাথের লেখা মৌলিক প্রবন্ধাবলী সংখ্যায় বেশী নয়। কিন্তু স্বল্প হলেও তিনি যেটুকু লিখেছেন সেটুকুই তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় ভাস্বর। তাঁর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের থীসিস্—'International Law and Custom in Ancient India'—বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য। তারপর নানা পাঠ্য পুস্তক লিখলেও আর কোন গবেষণা কাজ হাতে

নেননি। ১৯৫৭ সালে তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় দুই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। ১৯৬২-তে প্রকাশিত হয় ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনী—এতেও তিনি প্রধান সম্পাদকের ভূমিকা নেন। তিনি যদি কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিয়ে কালাতিপাত করতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কিছু অবিনশ্বর সম্পদ রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু সে অবসর তাঁর ছিল না। বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে তিনি নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন। যার ফলে আমরা সেই পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

সারা দেশে তাঁর কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ছড়িয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাকরণ ও হাইকোর্টের এখন যাঁরা মধ্যমণি, তাঁরা অনেকেই তাঁর প্রাক্তন ছাত্র। ভারতের বর্তমান প্রধান-বিচারপতি অজিতনাথ রায় তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পুরাতন ছাত্রদের কথায় তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'ত। কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করার পর, মাত্র এক বছরের জন্য, তিনি ম্যাট্রিকের খাতা পরীক্ষা করেছিলেন। সে বছর ঢাকা থেকে একটি ছাত্র এত ভাল উত্তর লিখেছিল যে খুশী হয়ে তিনি একশ'র মধ্যে একশ'ই দিয়েছিলেন। প্রধান পরীক্ষক এই নম্বর শেষ পর্যন্ত রেখেছিলেন কি-না জানা নেই। এই ছাত্রটি হলেন পরবর্তী কালের অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার।

এদেশে চিরদুর্লভ বিদগ্ধজনের একজন ছিলেন ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মনন ও চিন্তনের বহুমুখিতা, ও বিশিষ্ট বাক্‌পটুতা আমাদের বিস্মিত অভিভূতও করেছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর আচরণে ও কথাবার্তায় সর্বদা একটি বজ্রকঠিন দার্ঢ্য ফুটে উঠত, যা ছিল তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি যথার্থই বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ঔদার্য ও ঋজুতা আমাদের উনবিংশ শতকের সেই সব মহাপ্রাণ পূর্বসূরীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যাঁরা অন্যায় ও অধর্মের সঙ্গে কোন দিন আপোস করেননি। প্রমথনাথ বন্ধুবৎসল ছিলেন। শৈশবে, অর্থাৎ ৭০।৭৫ বছর পূর্বে, যাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের কথা মনে রেখেছিলেন। কত নিরাশ্রিতকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, কত বেকারের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কত দুঃস্থ পিতাকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করেছেন তার সীমাসংখ্যা নেই। বিগত যুগের এক অপসৃয়মান মূল্যবোধ থেকে এই শুভ প্রচেষ্টাগুলির উদ্ভব—এযুগের স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী মনোভাব বড় একটা প্রশ্রয় দেয় না এ'সবের।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান এক দিকে যেমন একটি গৌরবোজ্জল স্বর্ণযুগের অবসান ঘটিয়েছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে এমন এক শূন্যতা যা কোনদিনই পূর্ণ হবার নয়। ইংলণ্ডের প্রবীন ও বয়োজ্যেষ্ঠ ঐতিহাসিক পল্ ভিনোগ্রাডফ্ পরলোকগমন করলে তাঁর উদ্দেশ্যে মরিস্ পাউইক্ যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেই কথাগুলি স্মরণ করে আমি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম নিবেদন করছি—'In our academic harbours he lay like a great liner amidst all the bustle and hurry of shipping. He will become a memory and then a tradition, but the thought that he has gone on his last voyage leaves in those who know and admired him a strange desolation.'

হাসনুহানা

স্বাতী রায়

জানলার গরাদে মাথা চেপে ধরে শূন্য চোখে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন সুপ্রভা। মাথার একটা পাশ দপদপ করছে। সুপ্রভা জানেন আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিনা ওষুধে ওই দপদপানি থেমে যাবে। চশমার পুরু কাঁচটা ঝাপসা হয়ে আসছে। চোখ দিয়ে আজকাল অকারণে জল পড়ে। সুপ্রভা ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলেন। পাশের ঘরে শান্তা, তার বাবা আর মা'র সম্মিলিত কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হল।

একদিকে মা বাবা, অন্যদিকে একা মেয়ে। সুপ্রভা অনুভব করেন মা বাবার যুক্তিহীন জেদের কাছে শান্তা ক্রমশঃ কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই সে তাঁদের বোঝাতে পারছে না যে সুবীর ওয়াইন-মারচেন্টের ছেলে হলেও তার নিজের জীবনের সঙ্গে 'মদ' কথাটির যোগ বিশেষ নেই। আর তাই তার ঘরদোর 'মদে থৈ থৈও' করে না।

এঘরে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে সুপ্রভার ঠোঁটের কোণে একটা সরু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সে হাসি বড় ক্লান্ত, বড় বিষণ্ণ। আবছাভাবে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় একটি দিনের দেখা

ত্রিদিবেশকে। যে তাঁকে নিজের মুখে জানিয়ে দিয়েছিল, ‘আমাদের ঘরদোর মদে থৈ থৈ করে।’ শুনে সুপ্রভা কেঁপে উঠেছিলেন। সমস্ত জগৎ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য দুই হাতে মুখ ঢেকেছিলেন। সে আজ প্রায় দুই যুগ হল। সুপ্রভা তখন সপ্তদশী। আর কয়েকটা মাস পেরোলেই ইস্কুলের প্রাঙ্গন পেরিয়ে আসবেন। এমন সময় তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেটা অভাবিত কিছু নয়। বিশেষ করে তখনকার কালে। কিন্তু সুপ্রভা থম্‌কে গিয়েছিলেন পরেরটুকু শুনে। ছেলে নেভিতে চাকরি করে—বিশেষ কেউ নেই, কাজেই সে নিজে বাড়ীর বাইরে অভিভাবকদের গণ্ডি পেরিয়ে সুপ্রভার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলা বাহুল্য, সুপ্রভার সমগ্র সত্তা এতে প্রতিবাদ করে উঠেছিল। ওই ‘নেভি’ কথাটিই তার মধ্যে ভয় আর দ্বন্দ্বের পাহাড় গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। সুপ্রভার মনে হয়েছিল তার নিস্তরঙ্গ, নিরুদ্বেগ জীবনের মূল ধরে কে যেন নাড়া দেবার ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু বিবেচনাহীন সুপ্রভার কোন আপত্তি তাঁর প্রগ্রেসিভ, ব্যারিস্টার দাদার কাছে টিকতে পারেনি। তার বোন হয়েও সুপ্রভা যে কি করে দিন দিন ‘কুয়োর ব্যাঙ্’ হয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে মধ্য কোলকাতার সাধাসিধে একটা পার্কের সামনে এসে দাদা গাড়ী থামিয়েছিলেন। সুপ্রভার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। তার চেনাজানা কোন বন্ধুর কাছে এমন ভাবে কনে দেখার কথা সে কখনো শোনেনি। জনবিরল পার্কটার চারধারে ব্যস্তভাবে তাকাতে তাকাতে দাদার দৃষ্টি হঠাৎ একটা বুড়ো ঝাউগাছের কাছে গিয়ে থেমেছিল। দীর্ঘদেহ, ঝাঁকড়া চুল, দৃঢ় চিবুক আর ভীষণ কোমল দুই চোখের একটি যুবক তখন সুপ্রভাদের দিকে পাশ ফিরে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে। দাদা তাড়াহুড়ো করে কিছুটা এগিয়ে আবার পিছন ফিরলেন, সুপ্রভা তখনও একপা নড়েনি। হাত দুটো শক্ত করে মুঠি পাকিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। চোখ বুজলে এখনও সুপ্রভা দাদার সেই অসহিষ্ণু, স্নেহহীন, রুক্ষ মুখটা দেখতে পান। হাতের একটা ঝাঁকুনিতে সুপ্রভার মুঠি আলগা করে দাদা খালি বলেছিলেন, ‘আয়।’ আর কিছু বলতে হয়নি। জ্বালা করা চোখ দুটো কাপড় দিয়ে ঘষে নিয়ে সুপ্রভা এগিয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরলে সুপ্রভা অনুভব করলেন দাদা ফিরে গিয়েছেন। ত্রিদিবেশের সামনে সুপ্রভা একা। তাকে বাড়ী ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব ত্রিদিবেশের ওপরই দেওয়া হয়েছে। পার্কের বেড়ার ওপাশে কয়েকটা গাছের আড়ালে ত্রিদিবেশের কালো গাড়ীটার আভাস পাওয়া যায়।

পায়ের পাতা দুটো দিয়ে শক্ত করে মাটি অাঁকড়ে সুপ্রভা সাহস সঞ্চয় করে চোখ তুললেন আর তখনই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন হল, ‘ভয় পেয়েছ? তোমার বয়স কত? এতটা কম তা’তো আমাকে বলা হয়নি।’ প্রশ্নগুলোর পারম্পরিকতায় সুপ্রভা সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর দেবার আগে আবার ত্রিদিবেশই বলল, ‘এখানেই বসা যাক্। আপত্তি আছে?’ তখন আর আপত্তি করে কি হবে? সুপ্রভা ত্রিদিবেশের পাশটিতে বসে পড়েছিল। আর তাড়াতাড়ি বসতে গিয়েই বোধ হয় তার লম্বা বিনুনি থেকে এক থোকা হাসনুহানা ফুল ত্রিদিবেশের পায়ের কাছটিতে ঝুপ্ করে পড়ে গেল।

কিশোরী সুপ্রভা অবাক হয়ে দেখল এক মুহূর্তও দেরী না করে ত্রিদিবেশ ঠিক শিশুর মত লোভী মুখ নিয়ে হাত বাড়িয়ে ফুলের গুচ্ছটা তুলে নিয়ে জোর করে শ্বাস টানল।

'তুমি চুলে ফুল লাগাও ? তোমার গাছের ফুল ?'

'না।'

'না ?'

'আমারটা কয়েকদিন আগে মরে গেছে। এটা অন্যের গাছের। হাসনুহানা আমি খুব ভালোবাসি।'

'ভালোবাসো তো বাঁচাতে পারলে না কেন ? জল দাওনি ?'

'দিয়েছিলাম।'

'তবে ?'

সুপ্রভার মনে হয়েছিল ত্রিদিবেশের স্বর যেন কিছুটা অসহিষ্ণু। হাসনুহানার প্রসঙ্গ ওঠায় সে অনেকটা সহজ হয়ে আসছিল, কিন্তু ত্রিদিবেশের অসহিষ্ণুতা মেশানো রাগী ভাবটা তার মধ্যে আবার ভয় ঢুকিয়ে দিল। কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত করে সে কাঁপা গলায় বলেছিল—'বোধ হয় সবটা শিকড় তুলে আনা হয়নি।' এরপর ত্রিদিবেশ চুপ। খানিকক্ষণ তার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সবটা শিকড় উপড়ে না আন্‌লে গাছ বাঁচানো যায় না ? সব কিছু সাজিয়ে না দিলে কিছু সৃষ্টি করতে পার না ? তা হলে তোমার হল না। আমার মধ্যে অনেক কিছুর অভাব আছে। অনেক কিছু ভুল আছে।' ত্রিদিবেশ চুলের মধ্যে আঙ্‌ুল চালাল, 'আমাকে আমার জীবন থেকে বের করে না আনতে পারলে আমার বিয়ের দরকার নেই। আর তা যদি না পার তা'হলে নিজের জীবনকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়ালে তুমি কেবল কষ্টই পাবে···। তা আমি চাই না।'

নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ত্রিদিবেশ উঠে দাঁড়াল। 'আটটা বাজে। চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

একটা দম বন্ধ করা ভয়ের যে এত অনাড়ম্বর, নিরুত্তাপ পরিসমাপ্তি হতে পারে সুপ্রভা কল্পনাও করেনি। কথাটা পুরোপুরি বুঝতে তার একটু সময় লাগল।

গাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ত্রিদিবেশ কেমন দ্বিধাগ্রস্ত, গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে থেমে কেটে কেটে বলল, 'দেখো, কেন জানি না অনেক চেষ্টা করেও আমার আসল চেহারাটা তোমাকে দেখাতে পারলাম না। আমার জীবনযাত্রার আভাস তোমাকে দিতে পারলাম না। অথচ বাড়ী থেকে বেরোবার আগে ভেবে এসেছি আমার সত্যিকারের 'আমি'কে তোমায় চিনিয়ে দেব। যাতে তোমাকে মনস্থির করতে মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে না হয়। আমি জানি আজকের আমাকে তোমার খুব সেন্টিমেন্টাল, ভাবপ্রবণ মনে হচ্ছে। নেভিতে চাকরি-করা দুর্দান্ত লোকগুলো সম্বন্ধে যে সব ধারণা ছিল তা ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু এটা হবার কোন কারণ নেই। আই অ্যাম নো এক্‌সেপ্‌শান, আমার ঘরদোরও মদে থৈ থৈ করে, বিয়ে না করলেও সঙ্গিনীর অভাব আমার কখনো হয় না। আমার মধ্যেও বেপরোয়া ভাবের কিছু ঘাটতি নেই।' শুনে সুপ্রভা কেঁপে উঠেছিল।

সমস্ত জগৎ থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্য দুই হাতে মুখ ঢেকেছিল। কিন্তু লোকটার নির্দয়তায় বিন্দুমাত্র ছেদ পড়েনি। সুপ্রভার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে চলল, ‘আমাকে আমার এই জীবন থেকে নিজের জোরে যদি বের করে আনতে পারো তবেই আমার কাছে এসো। তা যদি না পারো তা’হলে জানবে তোমার জীবনধারাই পাল্টে যাবে। হয় আমাকে তোমার পথে টেনে আনো, নয় সরে যাও। এর মাঝামাঝি কিছু করতে গেলে তুমি মরবে।’ ‘মরবে’ কথাটার ওপর অসম্ভব জোর দিয়েছিল ত্রিদিবেশ। কোন পুরুষমানুষের মুখে এভাবে ‘মরবে’ কথাটার প্রয়োগ সুপ্রভা আশা করেনি। এরপর ত্রিদিবেশ কিছুটা ক্লান্ত হয়েই যেন সুপ্রভার হাতটা ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে বলল, ‘দেখো, সেই গল্পে উপন্যাসে যাকে ‘অপাপবিদ্ধ’ বলে না, তোমার মধ্যে বোধ হয় সেইরকম একটা কিছু আছে। তাই তোমাকে দেখে তোমার সামনে হঠাৎ আমার কেমন তোমার মত স্নিগ্ধ হতে ইচ্ছে করল। তোমাকে আমার জীবনের অসুন্দর দিকটা দেখাতে ইচ্ছে করছিল না। আচ্ছা, আমার কথাগুলো কি নভেলি ধাঁচের মত মনে হচ্ছে। আসলে এক কালে না আমিও লাইন মিলিয়ে পদ্য লিখতাম। নীল আকাশে সাদা বকের দলকে উড়তে দেখলে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে থেকে ঘাড় ব্যথা করে ফেলতাম। মনে হতো কি সুখ, কি শান্তি। সমুদ্রের শেষ দেখব বলে বোকার মত আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নেভিতে চাকরি নিয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে বাড়ী গিয়ে তোমাকে নিয়ে একটা কবিতাই বোধ হয় লিখে ফেলব।’ প্রচণ্ড জোরে অনেকক্ষণ ধরে দুলে দুলে হেসেছিল ত্রিদিবেশ। আর সুপ্রভা সেই ফাঁকে লক্ষ্য করল কথা বলতে বলতে তাঁদের এখনো পার্ক থেকে বেরোনোই হয়নি।

ত্রিদিবেশ আর সুপ্রভা পাশাপাশি মিলিয়ে পা ফেলতে ফেলতে কালো গাড়ীটার কাছে পৌঁছেছিল। তারপর সারাটা পথ ত্রিদিবেশ একটা কথাও বলেনি। সুপ্রভারও মনে হচ্ছিল কথার চাইতে এই মৌন-যাত্রা অনেক মুখর, অনেক পরিপূর্ণ।

বাড়ীর কাছে এসে সুপ্রভাকে নামিয়ে দিয়ে ত্রিদিবেশ মুখ বাড়িয়ে বলেছিল, ‘তুমি যাও। সব কিছু ভেবে দেখো। আজকের দিনটা বেশ ভালো লাগল। সব কিছু বড় সহজ মনে হল।’ তারপর একটু থেমে ঈষৎ যেন লজ্জিতভাবে অসহায়ের মত বলেছিল, ‘আর শোন, আমি তোমাকে আমার সম্বন্ধে খুব ভয় দেখিয়েছি বলে তুমিও যে ভয় পাবে, তার তো কোন মানে নেই। আসলে নিজের কথা বললেই লোকে বাড়িয়ে বলে জানো তো? আমিও হয়তো বাড়িয়েই বলছি। এখনও হয়তো আমার অভ্যেসগুলোর থেকে আমাকে তুমি বের করে আনতে পারবে। তোমার ওই স্নিগ্ধ চোখে নিজের ছায়া দেখতে ইচ্ছে করে। একবার রিস্ক্ নিয়ে দেখতে পারো। যাক্‌গে চলি। আবার দেখা হবে কিনা তুমিই ঠিক কোরো।’

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে আর সব গাড়ীকে পিছনে ফেলে কালো গাড়ীটার মিলিয়ে যাওয়া আজও সুপ্রভার চোখের ওপর ভাসে। এক নিমেষে ত্রিদিবেশ যেন হারিয়ে গিয়েছিল নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুপ্রভার জগৎ থেকে। সুপ্রভার বুকটা মুচড়ে উঠল কষ্টে, দুশ্চিন্তায়। এত জোরে গাড়ীটা চালালো কেন ত্রিদিবেশ। গাড়ীতে স্টার্ট দেবার আগে কুড়িয়ে নেওয়া হাসনুহানা ফুলের গুচ্ছটা যত্ন করে ড্যাসবোর্ডের ছোট্ট তাকে রেখে দিয়েছিল ত্রিদিবেশ। চোখের ওপর এসে পড়া

ঝাঁকড়া চুলগুলোকে পিছনে সরিয়ে হাতের উল্টো দিক দিয়ে কপালটা মুছেছিল। সুপ্রভার তখন অনিবার্যভাবে তার আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাওয়া হাসনুহানা গাছটা চোখের ওপর একটু একটু করে দুলে উঠছিল।

সেদিন সমস্ত রাতটা সুপ্রভা ছটফট করেছিলেন। একদিকে ঋজু বলিষ্ঠতার প্রতি মেয়েদের সহজাত আকর্ষণ, অন্যদিকে মেয়েলি সংস্কার আর ভয়। সুপ্রভার স্নিগ্ধ চোখের কথা বলতে গিয়ে অন্য দুটো চোখের কোণে তিনি কি জলের আভাস চিক্‌চিক্ করতে দেখেছিলেন? কিন্তু সে তো গল্পের নায়কদের কবে, বাস্তবে তো নয়। সুপ্রভার সমগ্র সত্তা সেদিন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সর্বক্ষণ যুদ্ধ করেছিল। নাটক-নভেলে পড়া নায়িকারা যারা তাদের কুপথগামী প্রেমাস্পদ অথবা স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছে, তাদের সঙ্গে সারারাত সুপ্রভা কথা বলেছে, যুক্তি খুঁজেছে আর নিজেকে কল্পনা করেছে তাদের ভূমিকায়। অথচ আশ্চর্য! যে মুহূর্তে সুপ্রভা নিজেকে বোঝাতে পেরেছে, উত্তাল সমুদ্রকে কাছে পাবার সংকল্পে দৃঢ় করেছে মন, তখনই হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় আর দ্বিধা তাকে গ্রাস করেছে। সুপ্রভা বুঝতে পারেনি তার রাতজেগে খুঁজে বের করা কুযুক্তিগুলির সার্থকতা। জীবন নিয়ে জুয়া খেলা তো পাপ, আত্মহত্যার সামিল!

সেদিনের সেই চিত্তবৈকল্য, অস্থির আবেগ আর কোমলতা আজকের প্রৌঢ়া সুপ্রভার বাইরের কাঠামোটায় আর প্রকট নয়। হেড্‌মিস্ট্রেস্ সুপ্রভাদি আজ অনেক কোমলমতি ছাত্রীরই ভয়ের কারণ। সুপ্রভার উত্তাপহীনতাকে তারা অবাক হয়ে পরখ করে।

না, সুপ্রভাকে কোন রকম পরীক্ষার সামনে পড়তে হয়নি। পরদিন রাতজাগা ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে বিছানা থেকে উঠে ত্রিদিবেশের অ্যাক্‌সিডেন্টের খবরটা কাগজে সুপ্রভাই প্রথম দেখেছিল। প্রথমে খানিকটা অবিশ্বাস, যন্ত্রণা আর ঝড়। তারপর গত সন্ধ্যার স্মৃতিটাকে সুপ্রভা খুব যত্ন করে বুকের মধ্যে সাজিয়ে রাখতে লাগল। একটুও যেন নষ্ট না হয়, একটুও যেন হারিয়ে না যায়।

তারপর আর ঘরবাঁধার স্বপ্ন সুপ্রভার দেখা হয়ে ওঠেনি। প্রেম নয়, অনুকম্পা নয়, মোহও নয়; সুপ্রভার মনে হয়েছে, কি এসে যায়। সাজানো সংসারকে রক্ষা করতে তো যে কেউ পারে। সেখানে তো সুপ্রভা অপরিহার্য নয়। সে পিছিয়ে গেলে আরও অনেক অনেক মেয়ে যারা সুন্দর ফুলে নিজেদের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে চায়, তারা এগিয়ে যাবে। তার শূন্যতাকে ঢেকে দেবে। অবশ্য তা বলে শিকড় ছাড়া গাছ বাঁচানো যায় কিনা সে পরীক্ষাও সুপ্রভা করেনি। জীবন নিয়ে জুয়া খেলা যে পাপ!

পাশের ঘরে শান্তার গম্ভীর শাঁখের মত স্বর শোনা যাচ্ছে। সুপ্রভা বুঝতে পারলেন তাঁর দাদা-বৌদির মুখে বিরক্তির রেখাও একে একে বাড়ছে। কিন্তু মেয়ের শান্ত কঠিন মুখ দেখে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে তাঁদের হার হয়েছে। শিকড় ছাড়া গাছ কি বাঁচানো যায়। ঝাপসা হয়ে আসা পুরু লেন্সের মধ্যে দিয়ে বাগানের হাসনুহানা গাছটার দিকে তাকালেন সুপ্রভা। অজস্র থোকা থোকা ফুলে ছেয়ে গেছে গাছটা। পাতা দেখা যায় না। বুড়ী পিসীমাকে খুশী করতে শান্তা ওটা কয়েক মাস আগে কোথা থেকে তুলে এনে পুঁতেছিল।

‘পথের দেবতা’র উৎসসন্ধানে

তপোব্রত ঘোষ

॥ এক ॥

‘পথের দেবতা’ এবং বিভূতিভূষণ

‘পথের দেবতা’ বিভূতিভূষণের সারস্বতজীবনের আরাধ্য পুরুষ। তাঁর অন্তরতম মানসলোকে এবং কথাসাহিত্যে এই ‘পথের দেবতা’ চেতনার উদ্ভব ও বিচিত্র বিকাশ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। অথচ বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরেও সমালোচকেরা তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কৃতির বিচারে ‘পথের দেবতা’ চেতনাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না।

সাহিত্যজগতে দুই জাতের শিল্পীর দেখা মেলে। প্রথম জাতের শিল্পীর জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের কোনও সাদৃশ্য নেই। বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত মধুসূদন। আবার আর–এক জাতের শিল্পীর জীবনই সাহিত্যে রূপায়িত হয়। তাঁরা জীবনশিল্পী। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘কবিজীবনী’ প্রবন্ধটি স্মরণ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ “কোনও ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন। কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল।” —এই অর্থেই বিভূতিভূষণ জীবনশিল্পী। ‘তৃণাঙ্কুর’ গ্রন্থে বিভূতিভূষণও বলেছেন ঃ “সাহিত্য শুধু জগৎটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়কনায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।” নিজের দিকে তাকিয়েই বিভূতিভূষণ একথা বলেছেন।

বিভূতিভূষণের ‘পথের দেবতা’ চেতনাও তাঁর সমগ্র জীবনভূমি থেকে অঙ্কুরিত, বিকশিত হ’য়েছে। নিজেকে তিনি একাধিকবার বলেছেন ‘অনন্ত পথিক’। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের বাঙালী কথাসাহিত্যিকগণের মধ্যে বিভূতিভূষণই পথ হেঁটেছেন সবথেকে বেশী। তাঁর প্রায় সবগুলি গ্রন্থই পথে পথে রচিত। তাঁর অজস্র দিনলিপিগুলিকে স্বচ্ছন্দে বলা যায় ‘পথলিপি’। ভ্রমণ-বহুল জীবন নয়, ভ্রমণই তাঁর জীবন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সূত্রপাতে, যখন কলকাতার

চতুষ্কলা সমিতি কল্লোল আন্দোলনের নান্দীপাঠ শুরু করেছে, তখন বিভূতিভূষণ গোরক্ষণী সভার ভ্রাম্যমান প্রচারকের কাজ নিয়ে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন। সারস্বতজীবনে এইটি তাঁর 'অভিযাত্রিক' পর্ব। মেঘনা-শীতলক্ষ্যা নদীতীরের শ্যামছায়াঘন গ্রামগুলিকে অতিক্রম করে অবশেষে যাত্রা করেছেন ব্রহ্মদেশে—আরাকান-ইয়োমা রেঞ্জের দুর্গম পথে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হ'য়ে তিনি চলে গেছেন বিহারে। জঙ্গলমহালে উদ্দাম ঘোড়া ছুটিয়ে কেটে গেছে কত জ্যোৎস্নারাত্রি। এই পর্বেই রচিত হ'য়েছে 'পথের পাঁচালী'। বিভূতিভূষণের পরবর্তী জীবনের যে কোনও বৎসরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ক্লান্তিহীন তৃপ্তিহীন পথ চলা ঃ "কখনও কন্টকাকীর্ণ আরণ্যপথ বেয়ে, কখনও রৌদ্রদগ্ধ মরুবালুর বুক চিরে, কখনও কোকিলকূজিত পুষ্পসুরভিত কুঞ্জবনের মধ্য দিয়ে।" (ঊর্মিমুখর—দিনলিপি)

সমগ্র জীবনব্যাপী ঐ পথচলার আনন্দই ঘনীভূত এবং ঊর্ধ্বায়িত হ'য়ে সৃষ্টি করেছে 'পথের দেবতা' তত্ত্ব। ঐ তত্ত্বসূত্রেই গ্রথিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টির ফুলগুলি। 'মানুষ আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে' তার বহিরঙ্গজীবনের তুচ্ছ ঘটনাপঞ্জী বিভূতিভূষণের জীবনী নয়। 'পথের দেবতা' চেতনাই তাঁর 'স্বপনমুরতি গোপনচারী' সত্তার আসল পরিচয়। এই তাঁর সত্যতর যথার্থ জীবনী। বিভূতিভূষণ তা জানতেন। তাই 'অপরাজিত' উপন্যাসের ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে অপু যে 'পথের দেবতা' চেতনার ব্যাখ্যা করেছে, তাকে প্রায় অবিকল ভাষায় 'তৃণাঙ্কুরে'র ব্যক্তিগত দিনলিপিতে আত্মসাৎ ক'রে প্রমাণ করেছেন 'পথের দেবতা' তত্ত্ব শুধু তাঁর সাহিত্যের একটি তত্ত্ব নয়, তা তাঁর জীবনেরও গভীরতম সত্য।

॥ দুই ॥

'পথের দেবতা' কে ?

'পথের দেবতা'র অস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের প্রথম রচনা ছোটগল্প 'উপেক্ষিতা'য়—গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশের সময়, গল্পটির যে শেষ অনুচ্ছেদটিতে 'পথের দেবতা'র তির্যক আভাস দেখা গিয়েছিল, 'মেঘমল্লার' গল্পসংকলনে গৃহীত হওয়ার পরে ঐ অনুচ্ছেদটি বর্জিত হয়। সেজন্য আপাততঃ এই দৃষ্টান্তটি ছেড়ে দিয়ে 'পথের পাঁচালী'র উপসংহার অংশটিকেই এবিষয়ে প্রথম স্থানের মর্যাদা দিতে হ'বে। তারপর নামান্তরে রূপান্তরে এই 'পথের দেবতা'ই বারেবারে দেখা দিয়েছেন 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ও 'দেবযানে'। দিনলিপিগুলির অসংখ্য অনুচ্ছেদ জুড়ে শোনা গেছে তাঁরই পদসঞ্চার।

'তৃণাঙ্কুরে' বিভূতিভূষণ 'পথের দেবতা' সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাকে সর্বসমেত তিনটি সূত্রে সংগ্রথিত করা যায়।

প্রথম সূত্র ॥ "মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোন এক বড় দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্ছে, হয়তো দুহাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ইজিপ্টে, যেখানে নলখাগড়ার বনে, শ্যামল নীল নদের তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধুবান্ধবের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেছে, তারপর এতকাল পরে আবার ষাটটি বছরের জন্য এসেছি—এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাইবোন,

অন্য বন্ধুজন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাব কে জানে? এই cycle of birth and death যিনি নিয়ন্ত্রিত করছেন, আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েছি—তিনি একজন বড় শিল্পী।" অর্থাৎ এখানে বিভূতিভূষণ বলতে চেয়েছেন যে তাঁর কল্পনায় জন্মমৃত্যুচক্র বিচিত্র জীবজীবনের মধ্য দিয়ে অনন্তকাল ধরে এক দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হ'য়ে চলেছে। বলা বাহুল্য এই দেবশিল্পীই 'পথের দেবতা'।

কিন্তু এহ বাহ্য। খণ্ডিত দৃষ্টিতে জন্ম ও মৃত্যুকে পৃথক মনে হ'লেও বিভূতিভূষণের সত্যাতর উপলব্ধিতে মৃত্যুও 'অনন্ত অপরাজিত জীবনের'ই একটি অংশ মাত্র। 'স্মৃতির রেখা'য় বিভূতিভূষণের চিন্তায় এই সত্যও ধরা পড়েছিল ঃ

"এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত জীবন—পৃথিবীর এই মৃত্যুস্পৃষ্ট না হ'য়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে—তা তোমার আমার সকলের।" ঐ 'অনন্ত জীবন'কেই 'অপরাজিতে' অপু বলেছে 'বৃহত্তর জীবন', বলেছে 'পৃথিবীর জীবনটুকু ঐ বৃহত্তর জীবনের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।' তাই, যেন নিজেকে সংশোধন করে পরবর্তী সূত্রে বিভূতিভূষণ লিখলেন ঃ

"বৃহত্তর জীবনচক্র যুগে যুগে কোন অদৃশ্য দেবতার হাতে এভাবে আবর্তিত হচ্ছে।···জয় হউক সে দেবতার. তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ময় হউক তাঁর প্রাণচক্রের নিত্য আবর্তনশীল বিশাল পরিধিতে।···তিনিই হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায় তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনিই জানেন।"

বলা বাহুল্য, এই অমুক্তির অন্ধকারে জ্যোতির্ময়, নিত্য আবর্তনশীল, মানুষের পথচলার দোসর দেবতাই 'পথের দেবতা'। 'বৃহত্তর জীবনচক্র' তাঁরই হাতে আবর্তিত হয়। নৈসর্গিক জীবন, মনোজীবন এবং আত্মিক জীবন—এই ত্রিস্তরের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে বৃহত্তর জীবনচক্র। এর মধ্যে নিসর্গ আবার বিভূতিভূষণের কাছে দ্বৈতরূপে প্রকাশিত ঃ একদিকে নিসর্গের কোমলমধুর রূপ, অন্যদিকে নিসর্গের মহানগম্ভীর রূপ। দুর্গম সারেণ্ডা অরণ্যে 'বিরাটের গম্ভীর মূর্তি'র সামনে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণের মনে হ'য়েছে যে বাংলাদেশের প্রকৃতি যেন লিরিক কবিতা, আর এখানে প্রকৃতি যেন এপিক কাব্য লিখে রেখেছে। [দ্রষ্টব্য ঃ দিনলিপি "হে অরণ্য, কথা কও"।] অর্থাৎ দাঁড়াল এই যে—কোমলমধুর নৈসর্গিক জীবন, মহান গম্ভীর নৈসর্গিক জীবন, মনোজীবন এবং সবশেষে বস্তুবিশ্বের বাতাবরণ অতিক্রম করে আত্মিকজীবন [অপু যাকে বলেছে 'এই জগতের পিছনে আর একটা জগৎ' ঃ 'অপরাজিত']—এই স্তরগুলিকে মিলিয়েই 'বৃহত্তর জীবনচক্র' গড়ে উঠেছে। আমাদের মনে রাখতে হ'বে শব্দটি 'চক্র' অর্থাৎ চক্রপথে 'পথের দেবতা'র চলাচল ঃ যে বিন্দু থেকে তাঁর যাত্রা শুরু, সেই বিন্দুতে আবার ফিরে এসেই তাঁর একটি পূর্ণ আবর্তন পরিসমাপ্ত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে 'দৃষ্টিপ্রদীপে' জিতুর কথা। 'পথের দেবতা'র উদ্দেশে জিতু বলেছে ঃ 'আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্রকে চালিয়ে দিই শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম করে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে আবার আনন্দভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।"

এই পথের দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি ? বিভূতিভূষণ 'তৃণাঙ্কুরে' বলেছেন ঃ "আমি দীন নই, দুঃখী নই, ক্ষুদ্র নই, মোহগ্রস্ত জড় মানব নই, আমি জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা।" অর্থাৎ মানুষ রূপে যাই হোক্ স্বরূপে সে 'পথিক আত্মা'। পথের দেবতা যুগযুগান্তর ধরে 'পথিক আত্মা'র হাত ধ'রে "আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্য দিয়ে" পথ চলেন। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ঃ 'পথের পাঁচালী'র অপু, 'আরণ্যকে'র সত্যচরণ, 'দৃষ্টিপ্রদীপে' জিতু, 'দেবযানে'র যতীন প্রত্যেকেই পথিক, সচরাচর যাদের আমরা 'ভবঘুরে চরিত্র' বলে থাকি। বিভূতিভূষণ 'তৃণাঙ্কুরে' নিজেকে 'পথিক আত্মা' কল্পনা করে 'পথের দেবতা'র উদ্দেশ্যে যা বলেছেন তাকে আমরা তৃতীয় এবং শেষ সূত্র বলতে পারি ঃ "গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে, হে অজানা অনন্ত। নিজেকে দিয়ে বুঝেছি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টিকে দিয়ে বুঝেছি তুমি কত বড় স্রষ্টা।" জনৈক সমালোচক বলেছেন, "পথের দেবতা মানব ভাগ্যবিধাতা। তাঁর ইঙ্গিতে মানুষ পথ চলে।" একথা যে যথার্থ নয়, তারই প্রমাণ ঐ তৃতীয় সূত্র। 'মানব ভাগ্যবিধাতা' শব্দটির মধ্যে অনভিপ্রেত ঐশ্বর্যমূর্তির আভাস আছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ বিশুদ্ধ লীলাবাদী, মধুর রসের রসিক। 'পথের দেবতা' 'পথিক আত্মা'র লীলাসহচর। আনন্দরূপে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর ইঙ্গিতে মানুষ পথ চলে না, বরং তিনিও মানুষের দোসর হয়ে এগিয়ে চলেন 'বৃহত্তর জীবনচক্র' পথে।

বিভূতিভূষণের কল্পনা আরও সুদূরপ্রসারী। তিনি শুধু মানুষের পথিক সত্তাকেই দেখেননি, বিশ্ব ও কালের মধ্যেও পথিক সত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। প্রথমটিকে 'স্মৃতির রেখা'র দিনলিপিতে নিজেই বলেছেন 'পথিকবিশ্ব' 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে জিতুর মুখে নিজের অনুভূতিকেই ভাষা দিয়ে বলেছেন ঃ "বিশ্বের এই পথিকরূপকে ভালবাসি।" পথিকবিশ্বের সঙ্গেই আছে পথিক-কালের কল্পনা। 'পথের পাঁচালী'র 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে নীলকণ্ঠ পাখীর সন্ধানে ইছামতীর কূলে অপুর প্রথম ভ্রমণের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে ঃ "গতিশীল কালের প্রতীক নির্জন শীতের অপরাহ্ণ।" শীতের অচিরস্থায়ী দিনান্তের মধ্যেই প্রকৃতিরসিক বিভূতিভূষণ লক্ষ্য করেছিলেন কালের সুস্পষ্ট দ্রুতগতি। এরপর 'পথিককালের' নিগূঢ়াভাস নিয়ে বহুবার শীতের অপরাহ্ণ তাঁর রচনায় দেখা গেছে। হরিহরের মৃত্যুর সময়ে এবং 'আরণ্যকে' সত্যচরণের প্রথম অরণ্যদর্শনের পটভূমিতে ঐ একই প্রতীক নিয়ে শীতের অপরাহ্ণ দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর রচনায় অপরাহ্ণ মাত্রই হ'য়ে উঠেছে পথিককালের প্রতীক। এই জন্যই অপরাহ্ণ তাঁর গল্প উপন্যাসে সর্বাধিক ব্যবহৃত পটভূমি। অনেকে বিভূতিভূষণের এই অপরাহ্ণ প্রিয়তার মধ্যে রোমান্টিক বিষন্নতাকে খুঁজতে চেয়েছেন। তাঁরা বিষয়টিকে আরও তলিয়ে দেখেননি বলেই মনে হয়।

দেখা গেল 'পথের দেবতা' 'বৃহত্তর জীবনচক্র'পথে চলাচল করেন, তাঁর ঐ চক্রাবর্তনের দোসর 'পথিক আত্মা', 'পথিক বিশ্ব' ও 'পথিক কাল'।

এবারে 'পথের পাঁচালী'র উপসংহার অংশে 'পথিক আত্মা' অপুর প্রতি পথের দেবতার সম্ভাষণটিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। পথিক আত্মা প্রথমে যাত্রা করে বিশ্বের এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঃ "...সোনাডাঙার মাঠ ছাড়িয়ে ইছামতী পার হ'য়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের

পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে, দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে……।” তারপর তার যাত্রা জন্ম থেকে জন্মান্তরে ও কাল থেকে কালান্তরে ঃ “দিনরাত্রি পার হ’য়ে, জন্মমরণ পার হ’য়ে, মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হ’য়ে চলে যায়……পথ আমার তখনও ফুরায় না……চলে……চলে……এগিয়েই চলে।” দেশ, জন্ম ও কাল অতিক্রম ক’রে এসেছে অনন্তের আহ্বান ঃ “অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ।” বাঙালীর চেতনার সঙ্গে কৃষ্ণের বাঁশীর রূপকল্পটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ‘বৈষ্ণব কবির গান’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন ঃ “সৌন্দর্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটি বাঁশী।” কিন্তু পথের দেবতার হাতে বাঁশীর বদলে বীণা তুলে দেওয়া বিভূতিভূষণের স্বোন্মেষণশীল প্রতিভারই দৃষ্টান্ত। এই বীণা সৃষ্টিরই বীণা। ‘দৃষ্টিপ্রদীপে’ বিভূতিভূষণ বলেছেন ঃ “মর্তে ও অমর্তে তাঁর সৃষ্টিবীণার দুই তার।” অপ্রাসঙ্গিক হ’লেও একটি বিষয়ে সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ‘বীণা’র বিশেষণ রূপে ‘অনির্বাণ’ শব্দটি ব্যাকরণসম্মত নয়। সম্ভবতঃ ‘লিপিকা’র [প্রকাশ ঃ ১৯২২] প্রথম গীতিগদ্য ‘পায়ে চলার পথে’র শেষাংশে “তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসবে"র পরোক্ষ প্রভাবই এই সুন্দর ভ্রান্তির জন্যে দায়ী।

॥ তিন ॥

‘ভাবজীবন’ এবং ‘আনন্দজীবন’

‘পথিক আত্মা’ মানুষের জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তেই তার কাছে ‘পথের দেবতা’র আহ্বান এসে পৌঁছায়। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বিভূতিভূষণের কল্পনায় এই মুহূর্তটি কখন দেখা দিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বিভূতিভূষণের দুঃখতত্ত্বের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। আসলে ‘পথের দেবতা’ তত্ত্ব আর এই দুঃখতত্ত্ব পরস্পর বেণীবন্ধন রীতিতে সংগ্রথিত। বিভূতিভূষণের দুঃখতত্ত্ব আলোচনার প্রাক্কালে তারই উৎসমূলে বিরাজিত রবীন্দ্রনাথের “দুঃখ” শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা স্মরণীয়।

‘ধর্ম’ গ্রন্থের ঐ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ “মানুষের একটিমাত্র আপনার ধন” আছে, সেটি দুঃখধন।……“অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য বলিয়া জানিব।……মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃ পদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে…।”

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। ‘দুঃখই গতি’—এই কথাটি বিভূতিভূষণের মানসলোকে একটি দিব্যসংকেতের মতোই ফুটে উঠেছে। ১৯৪৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ‘তৃণাঙ্কুরে’র দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ প্রায় অনুরূপ কথা বলেছেন ঃ “দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ, দৈন্য বড় সম্পদ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড়ো সম্পদ, মহৎ সম্পদ।” আরও বলেছেন ঃ “আমার সমগ্র

ভাবজীবনের সমষ্টি এইসব দুঃখও বেদনা, অবশ্য হয়তো অনেকটা দুঃখ বাস্তব, অনেকটা কাল্পনিক··· ।'' 'ভাবজীবন' শব্দটি বিভূতিভূষণ বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এই বেদনাসম্ভব 'ভাবজীবন'ই কিন্তু শেষকথা নয়। বিভূতিভূষণ এর পরেই বলেছেন : "···পথে, ঘাটে, বৈকালের ছায়ায়, দুপুরের রোদে, যে আনন্দজীবনের শুরু, আমি ভেবে মুগ্ধ হই, তা এখনও অটুট অক্ষুণ্ণ রয়েছে—আরও পরিপূর্ণভাবে দেশে বিদেশে তার গতি নিত্যনবতর পথে।'' অর্থাৎ দুঃখ ও বেদনা দিয়ে গড়া ভাবজীবনই 'দেশেবিদেশে নিত্য নবতর গতির পথে' 'আনন্দজীবনে' উন্নীত হয়। বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে এই আনন্দজীবনের অধিকারী মানুষই যথার্থ যাত্রী : 'পথিক আত্মা'। এই আনন্দজীবনের অধিকারীকেই পথের দেবতা পরিয়ে দিয়েছেন "আনন্দযাত্রার অদৃশ্য তিলক''। ['পথের পাঁচালী'র উপসংহার স্মরণীয়]

'পথের পাঁচালী'তে বারবার মৃত্যুর বেদনার মধ্য দিয়ে অপুর 'ভাবজীবন' গড়ে উঠেছে। ইন্দির ঠাক্‌রুণের মৃত্যু তার শৈশবে, দুর্গার মৃত্যু তার বাল্যে, হরিহরের মৃত্যু তার কৈশোরে। এক একটি মৃত্যুর বেদনা দিয়ে গড়া 'ভাবজীবন' শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে কৈশোরে 'নিত্যনবতর গতির পথে' 'আনন্দজীবনে' রূপায়িত হ'য়েছে এবং পরিশেষে 'পথের দেবতা'র অনির্বাণ বীণার সুরে বৃহত্তর জীবনের আলোক, তাপ, গতি ও প্রাণে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

প্রশ্ন উঠেছে যে 'আম আঁটির ভেঁপু'র শেষে নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগের সময়েই কি 'পথিক আত্মা'র কাছে 'পথের দেবতা'র আহ্বান আসতে পারত না? সেই আহ্বানের জন্য 'অক্রুরসংবাদ' অংশের কি প্রয়োজন ছিল? অন্ততঃ এই যুক্তি দেখিয়েই T. W. Clerk 'পথের পাঁচালীর' ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ 'অক্রুরসংবাদ' অংশটিই পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের দুঃখচেতনার মধ্যেই এই প্রশ্নের সম্ভাব্য সদুত্তর লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। নিশ্চিন্দিপুরের বালক অপুর দুঃখবোধ বিভূতিভূষণের ভাষাতেই "অনেকটা বাস্তব অনেকটা কাল্পনিক''। [দ্রঃ "তৃণাঙ্কুর''] মহাভারতের কর্ণের দুঃখে আকুল হওয়া ঐ কাল্পনিকতারই দৃষ্টান্ত। শিশু ও বালক অপুকে সংসারের বাস্তব দুঃখশোক থেকে অনেকখানি আড়াল করে রেখেছে সর্বজয়া ও দুর্গা। কিন্তু 'অক্রুরসংবাদে' কিশোর অপুকে চলতে হ'য়েছে নগরের কঠিন রাজপথে, বাস্তব সংসারের নির্মম আঘাত বুক পেতে নিতে হয়েছে। আমরা স্মরণ করতে পারি, অপুকে নিষ্ঠুর আশ্রয়দাতার চাবুক মারার বেদনাদায়ক ঘটনাটি দিয়েই 'পথের পাঁচালী' সমাপ্ত হ'য়েছে। এইভাবেই তার অপরিণত 'ভাবজীবন' 'আনন্দ-জীবনে' পরিণতি লাভ করেছে, অপু হ'য়েছে 'পথিক আত্মা'। এর আগে তার কাছে পথের দেবতার আহ্বান আসা সম্ভব ছিল না।

॥ চার ॥

॥ চক্রাবর্তন সূত্রের প্রয়োগ ॥

আবার আগের কথায় ফিরে আসি। আমরা বলেছি 'পথের দেবতা' 'বৃহত্তর জীবনচক্র'পথে চলাচল করেন। এর প্রথমে আছে কোমলমধুর নিসর্গজীবন, পরে মহানগম্ভীর নৈসর্গিক জীবন,

মনোজীবন ও আত্মিকজীবন। যেহেতু তা চক্রপথ, তাই 'পথের দেবতা' আত্মিকজীবন পরিক্রমান্তে আবার ফিরে আসেন পূর্বস্থানে ঃ নৈসর্গিক জীবনে।

অথচ সমালোচকেরা যাওয়াটাকে লক্ষ্য করেছেন, ফিরে আসাকে নয়। ফলে 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টা বিভূতিভূষণের সাহিত্যজীবনের উপান্তে 'দেবযান' রচনাকে স্মরণ রেখেই তাঁদের মনে হ'য়েছে যে বিভূতিভূষণ বুঝি শেষপর্যন্ত অলোকপন্থী অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু সত্য তার বিপরীত। 'পথের দেবতা' 'দেবযান' থেকে চক্রাবর্তন পথে আবার অবতরণ করেছেন নিসর্গ জগতে, মর্ত্যপৃথিবীর এই মধুর মৃত্তিকায়, যেখানে চিরশৈশবের আম আঁটির ভেঁপু চিরকালই বেজে চলেছে।

'পথের দেবতা'র ঐ চক্রাবর্তন সূত্রটি তখনই সার্থক হ'বে যখন বিভূতিভূষণের রচনার মধ্যে এর সমর্থন মিলবে। আমরা বিভূতিভূষণের ছয়টি প্রধান উপন্যাস গ্রহণ করব ঃ 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান' এবং 'ইছামতী'।

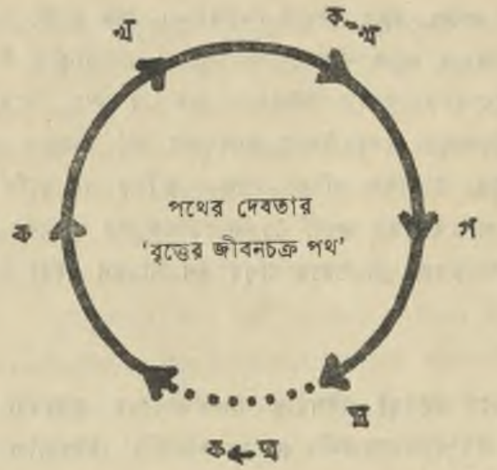

[চিত্র ঃ ক ঃ গীতিকাব্যধর্মী নিসর্গজীবন ঃ 'পথের পাঁচালী'
খ ঃ মহাকাব্যধর্মী নিসর্গজীবন ঃ 'অপরাজিত'
ক-খ ঃ দুই নিসর্গের যুক্তবেণী ঃ 'আরণ্যক'
গ ঃ মনোজীবন ঃ 'দৃষ্টিপ্রদীপ'
ঘ ঃ আত্মিকজীবন ঃ 'দেবযান'
ঘ—>ক ঃ প্রত্যাবর্তন ঃ 'দেবযান'—>'ইছামতী']

'পথের পাঁচালী'তে 'পথের দেবতা'র দোসর হ'য়ে 'পথিক আত্মা' অপু চলেছে পলিমৃত্তিকাপালিত দক্ষিণবঙ্গের নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের গীতিকাব্যধর্মী [স্মরণীয় বিভূতিভূষণের উক্তি ঃ "বাংলা দেশের প্রকৃতি লিরিক কবিতা।"] নিসর্গলোকের মধ্য দিয়ে ঃ "এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়ে পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফুল চারিধারে। সুঁড়িপথটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বনকলমী, নাটা-কাঁটা, ময়নাঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোনদিকে লইয়া ফেলিতেছে…সে যেন স্বপ্ন, সে যেন মায়া, চারিপাশ ঘিরিয়া পাখী গান গায়, ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া ফুল পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।" পথের পাঁচালীর প্রকৃতি সর্বদাই এইরকম কোমলমধুর লাবণ্যে পরিপূর্ণ। আর এই নিসর্গজীবনের ঊর্ধ্বে অপু দেখতে পায় ঃ "নীল নির্জন আকাশপথে এক উদাস গৃহবিবাগী পথিক দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে চলে।"

'অপরাজিত' উপন্যাসে 'পথের দেবতা'কে অনুসরণ ক'রে পথিক অপু এসেছে বিন্ধ্যারণ্যের দুর্গম অঞ্চলে। দেখা দিল প্রকৃতির মহাকাব্যিক মূর্তি ঃ "অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ও আঁধারের পিছনকার পাহাড়ের গম্ভীরদর্শন অনাবৃত গ্রানাইট প্রাচীরটা কি অদ্ভুত দেখায়। শালকুসুমের সুবাস ভরা অন্ধকার, মাথার উপরকার আকাশে অগণিত নৈশনক্ষত্র। এখানে…আছে শুধু সে, আর এই বিশাল অরণ্য প্রকৃতির কর্কশ, বন্ধুর, বিরাট সৌন্দর্য—।…স্তব্ধ রাত্রি, আকাশ অন্ধকার…পৃথিবী অন্ধকার…আকাশে বাতাসে অদ্ভুত নীরবতা, আবলুসের তালপাতার ফাঁকে দু'একটা তারা যেন অসীম রহস্যভরা মহাব্যোমের বুকের স্পন্দনের মত দিপ্‌দিপ্ করে, বৃহস্পতি স্পষ্টতর হয়, উত্তরপূর্ব কোণের পর্বতসানুর বনের উপরে কালপুরুষ উঠে, এখানে ওখানে অন্ধকারের বুকে আগুনের আঁচড় কাটিয়া উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে।…রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল—অদ্ভুত ভাবে সচেতন হইয়া উঠিল।"

'আরণ্যক' উপন্যাসে এই দুই বিপরীত নিসর্গজীবনের যুক্তবেণী গাঁথা হ'য়েছে। পথিক সত্যচরণ একই সঙ্গে ঐ 'গীতিকাব্যধর্মী' ও 'মহাকাব্যধর্মী' নিসর্গজীবনের যাত্রী। তার যাত্রাপথের একপাশে 'রুক্ষ কর্কশ' লবটুলিয়া বইহারের ভৈরবী মূর্তি 'অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে' দিক্‌বিদিক্ ব্যাপ্ত ক'রে দেখা দেয়। আবার অন্যদিকে 'সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় আর্দ্র' স্বপ্নময় সরস্বতী কুণ্ডী ঃ 'বন্য নিম গাছের সুবাস ছড়ায় বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফোটে, জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোম্‌রা লতার নৈশপুষ্পের মৃদু সুবাস।'

'দৃষ্টিপ্রদীপে' এসে 'পথের দেবতা'কে আর নিসর্গে দেখা গেল না। দেখা গেল দৃষ্টিপ্রদীপের দিব্যদীপ্তিতে জ্যোতির্ময় মনোলোকে। এই উপন্যাসের নায়ক জিতুও পথিক, তবে অপুর

মতো প্রকৃতি প্রেমিক নয়। কিন্তু সে অসাধারণ। তার অতিরিক্ত অনুভূতি শক্তির সাহায্যে সে তার মনোলোকের রহস্যকে বহির্জগতে প্রতিফলিত করতে পারে। সে দেখতে পায় 'অনেক দূরে পাহাড়ের ও বনানীর মাথার ওপরে নীলাকাশ বেয়ে যেন একটা পথ…হলুদ আলোর বিশাল জ্যোতির্ময় পথটা এই পৃথিবীর পর্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে শূন্যভেদ ক'রে মেঘরাজ্যের ওদিকে কোথায় চলে গেছে।" বলা বাহুল্য এই পথ "সোনাডাঙা মাঠ, পদ্মফুলেভরা মধুখালি বিলের ধার দিয়ে চলে যাওয়া" পথের সগোত্র নয়। আসলে বাস্তবে নিসর্গলোকে এ পথ কোথাও নেই, আছে জিতুর মনোলোকে। উদ্ধৃতাংশে 'যেন'—এই সংশয়বাচক শব্দটি সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়। ঐ মনোলোকের পথ বেয়েই চলেছেন 'পথের দেবতা'ঃ "মনে হ'ল কোথায় যেন একজন পথিক আছেন, ঐ নীলাকাশ, ঐ রঙীন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পিছনে তিনি চলেছেন… চলেছেন……।"

'দৃষ্টিপ্রদীপে'ই 'পথিক আত্মা'র চারিদিকের বস্তুবিশ্ব ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এসে অবশেষে লুপ্ত হয়েছে 'দেবযানে'। এখানে দেখা দিল লোকোত্তর আত্মিক জীবন। যতীন সেই আত্মিক জীবনচক্রের যাত্রী। 'দেবযান' শিল্পসৃষ্টি হিসেবে সার্থক কি না, এখানে সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'পথের দেবতা' চেতনা যে এখানে এসেই একটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এখানে 'পথিক আত্মা' মানুষেরও সমস্ত দেহরূপ নির্মোকের মত খসে পড়েছে, বেরিয়ে এসেছে তার চিৎ-শরীর। তার সম্মুখে অনাবৃত হয়েছে জ্যোতির্ময় সপ্তলোক। পথ চলে গেছে "এদেরও দূর, বহুদূর পারে, সব আকাশ ও সময়ের পারে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেখানে এক হ'য়ে মিলিয়ে গিয়েছে—সোম সূর্য নেই, তারকা নেই, অন্ধকার নেই, আলোও নেই—সেই এক বহুদূর দেশে সে গিয়ে পোঁছেছে……।" বলা বাহুল্য শিল্পী এখানে হ'য়ে উঠেছেন তত্ত্বদর্শী। ঐ পথে যখন 'পথের দেবতা'কে দেখা গেল, তখন আর তিনি মানুষের 'পথের দোসর' নন, বিভূতিভূষণের হিন্দু-সংস্কারে অধিবাসিত হ'য়ে তিনি 'কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু' মূর্তিতে দেখা দিলেন। বিভূতিভূষণ বললেন "বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন……তুমি, আমি, জন্ম, মরণ, দেশকাল……সবই তাঁর স্বপ্ন।" কিন্তু এ যে একেবারে আত্মদ্রোহ! কারণ বিভূতিভূষণ নিজেই তো বলেছেন তিনি লীলাবাদী, 'পথিক আত্মা' ও 'পথের দেবতা' পরস্পরের লীলাসহচর। স্বভাবতই বিভূতিভূষণ, তাঁর পক্ষে অসম্ভাবিত ঐ অদ্বৈত-সৃষ্টিতে অবিচলিত থাকতে পারেননি। তিনি পারতেন না থাকতে। তাই আত্মিকজীবন থেকে সরে এসে যতীন আবার নবজন্ম লাভ করল নবীন শিশুমূর্তিতে—বাংলাদেশেরই এক গ্রামে। বিভূতিভূষণ জানিয়েছেন, যশোহর জেলারই সেই গ্রাম! অপুর নিশ্চিন্দিপুরও ছিল যশোহর জেলায়, স্বয়ং বিভূতিভূষণের জন্মভূমি বারাকপুরও যশোহর জেলারই গ্রাম। 'দেবযানে' যতীনের দৃষ্টিতে তার জন্মভূমির চিত্রটি এইরকম ঃ "নিবিড় বাঁশবনে ঘুঘু ডাকছে উদাস মধ্যাহ্ন বেলায়, বনে বনে তিৎপল্লার হলুদ ফুল ফুটেছে। যতীন অনেকদিন পরে বাংলার শরতের এই সুপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখলে। বাঁশ-ঝাড়ে সোনার সড়কির মত নতুন বাঁশের চারা ঠেলে উঠেছে, বনসিমতলায় বেগুনি ফুল ফুটে ঝোপের মাথা আলো করেছে—বর্ষার শেষে জল মরে যাচ্ছে ডোবায়, পুকুরে নদীতে, তীরের টাটকা কাদায় সাদা বক গেঁড়িগুগলি খুঁজে বেড়াচ্ছে, জলের ধারেই কাশফুলের ঝাড় থেকে হাওয়ায় কাশফুলের

সাদা তুলোর মত পাপড়ি উড়ছে।" এই বর্ণনার সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র গীতিকাব্যধর্মী কোমলমধুর নিসর্গজীবনের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। অর্থাৎ 'পথিক আত্মা' আবার ফিরে এল পূর্বস্থানে—নিসর্গ-জীবনে। সঙ্গে সঙ্গে লীলাসঙ্গী হ'য়ে 'পথের দেবতা' ও 'বৃহত্তর জীবনচক্রে'র একটি পূর্ণ আবর্তন সমাপ্ত ক'রে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পদ্মফুলেভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, সোনা-ডাঙ্গার মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতীর তীরে ফেলে যাওয়া স্থানে ফিরে এলেন। জন্মভূমির তৃণপুষ্পশয্যায় শায়িত পরিশ্রান্ত সেই দেবতাকেই আবার নতুন করে প্রথম মুহূর্তের দৃষ্টিতে দেখলেন বিভূতিভূষণ। 'দেবযানে'র প্রায় চার বৎসর পরে প্রকাশিত 'হে অরণ্য কথা কও' গ্রন্থের একটি দিনলিপিতে সেই অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতাটিই অবিস্মরণীয় বাণীমূর্তি লাভ করল: "…নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে ছায়াগহন প্রাচীন আমবাগানে ঢুকে দেখেছি বনের কোণে তিনি পত্রশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন। ঝুরঝুর করে ঝরা পাপড়ি ঝরে পড়ছে সোঁদালি ফুলের ওঁর শয্যার ওপর। ডালে ডালে বনের পাখি নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে, কত কি বন্যলতার গাছ ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে দুলছে ওঁর বুকের কাছে, মুখের কাছে। …মহাশিল্পী মহাকবি উনি, নিজের অনন্তশয্যার অস্তনিদ্রার স্থানটি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে বসবেন আমি যেসব ফুল ভালবাসি বা দেখেছি তাই দিয়ে।"

এরপর আর বোধহয় বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না যে কেন বিভূতিভূষণের জীবনের সর্বশেষ উপন্যাসের শিরোনামা: 'ইছামতী'। প্রথম পথিক অপু একদিন ইছামতীর তীরে দাঁড়িয়ে পদাতিক পৃথিবীর সত্যকে প্রথম আবিষ্কার করেছিল। 'পথের পাঁচালী'তে "ইছামতীর চলোর্মিচঞ্চল স্বচ্ছ জল-ধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা" দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ দুয়ে মিলে এক না হ'লেও তারা চলেছে পাশাপাশি। আর জীবনের প্রান্তে সেই স্থানটিতে ফিরে এসেই অপুর স্রষ্টা স্বয়ং বিভূতিভূষণ 'ইছামতী'র জোয়ার ভাঁটার আবর্তনে মৃত্যুঞ্জয়ী "বৃহত্তর জীবনের" অপাবৃত সত্যকে মানসপ্রত্যক্ষ করেছেন: "কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, জোয়ারে যায়, আবার ভাঁটায় উজিয়ে আসে, এমনি বারবার করতে করতে মিশে গেল দূর সাগরের নীল জলের বুকে।……মৃত্যুকে কে চিনতে পারে, গরীয়সী মৃত্যু-মাতাকে? পথপ্রদর্শক মায়ামৃগের মত জীবনের পথে পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সে, অপূর্ব রহস্যে ভরা তার অবগুণ্ঠন কখনও খোলে শিশুর কাছে, কখনও বৃদ্ধের কাছে……তেলাকুচো ফুলের দুলুনিতে অনন্তের সে সুর কানে আসে……কানে আসে বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণে, প্রথম হেমন্তে বা শেষ শরতে।" 'পথের পাঁচালী'তে ইছামতী ও জীবন-প্রবাহ ছিল উপমেয়-উপমান সম্পর্কে সম্পর্কিত, আর 'ইছামতী' উপন্যাসে নদীই স্বয়ং 'বৃহত্তর জীবনে'র অমরপ্রবাহ হ'য়ে উঠে সৃষ্টি করেছে অভেদাঙ্গ অতিশয়োক্তি। নিসর্গজীবনে ফিরে এসে 'তেলাকুচো ফুল' 'বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণ' 'হেমন্ত ও শরতের' উদ্দীপন বিভাবই পরিপুষ্ট করে তুলেছে ঐ পরম প্রত্যয়টিকে। এখানেই বিভূতিভূষণের "পথের দেবতা" চেতনার পরাসিদ্ধি॥

মৃগতৃষ্ণিকা ইত্যাদি

অরিন্দম চক্রবর্তী

আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এক জায়গায় বলেছেন যে আমাদের কোনও অনুভবকে ভ্রম বলে চিনতে পারার মধ্যে চোখ থেকে আবরণ খসে পড়ার মত একটা অদ্ভুত চেতনা জড়িত থাকে। ভুল ভাঙার সময়ে আমরা অবাক হই—"কি করে এই ভুল করেছিলাম ?"[১] কি করে দড়িকে ভেবেছিলাম সাপ ? কি করে শুকনো মরুতে প্রত্যাশা করেছিলাম জলাশয় ? কি করে রূপো ভেবে ছুট্‌লাম ঝিনুকের দিকে ? অনুরূপভাবে, অজ্ঞানপাশমুক্ত সমাধিমান্ পুরুষ অবাক হন—কি করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ভাবতে পারলাম খণ্ডজীব ? আলো-আঁধারের মতো একান্ত বিপরীত এই দেহ আর আত্মার পরস্পরের বা পরস্পরের ধর্মের অভেদভাবনা কি করে করেছিলাম ?

---

(১) 'Advaita Vedanta and its Spiritual Significance' *The Cultural Heritage of India* (Ramakrishna Mission)

এই অবাক্ হওয়ার গর্ভেই জন্ম নেয় দার্শনিক জিজ্ঞাসা—এই যে একটা জিনিসকে আরেকটা ভাববার একান্ত অসম্ভব অথচ নৈসর্গিক লোকব্যবহার—এ কী করে হয় ? —যে জিজ্ঞাসা করেছেন শংকর [বহ্মনূত্রের অধ্যাসভাষ্যে] এবং সক্রেটিস্ [‘থীটিটাস্’-নামক ডায়ালগে], অ্যালেক্‌জাণ্ডার [‘সোস্-টাইম্-ডিইটি’ গ্রন্থের ৩য় ভাগ ৮ম অধ্যায়ে], এবং রাসেল [‘প্রব্লেম্‌স্ অব ফিলসফি’ বইয়ের দ্বাদশ অধ্যায়ে]।

এই জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট করবার জন্য ভাগ করা হয়েছে কতকগুলি প্রশ্নগুচ্ছে ঃ—

১। ভুল জানা [যথা, কান শুনতে ধান শোনা, দুটো চাঁদ দেখা, জ্বরের মুখে খাবার তেতো লাগা, কিন্তু অংক ভুল করা বা যুক্তিতে ভুল করা—এ জাতীয় নয়—মানে যাকে বলে perceptual error]-র মানস ইতিহাস কি ?

২। ভুল জানার ‘বিষয়ের’ স্বরূপ কি ?

৩। ভুল জানার জন্য যে যা নেই এমন জিনিসের জন্যও আমরা ছুটে যাই বা পালাই, সেই প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা কি ?

এবং

৪। ভুল ভাঙার স্বরূপ কী ?

এই প্রশ্নগুচ্ছের ছটি বিভিন্ন উত্তরমালা নিয়ে বেরিয়ে এলো ভারতীয় দর্শনের ছটি প্রধান খ্যাতিবাদ। পাশ্চাত্য দর্শনেও খ্যাতিবাদ জন্মেছে—যদিও ওপরের প্রশ্নগুলির সব কটির উত্তর যে সবাই-ই দিয়েছেন এমন নয়। বিশেষতঃ, সম্প্রদায়ধারা বজায় রেখে দীর্ঘকাল মোটামুটি একই পরিভাষায় দর্শনচর্চা করায় ভারতীয় দার্শনিকরা ভ্রমজ্ঞানের আলোচনায় যে স্পষ্টতা আনতে পেরেছেন প্রতীচ্যে তার একান্ত অভাব। অনেক ঐক্য ও বিরোধের চিহ্ন সেখানে নিত্যনূতন পরিভাষার স্বেচ্ছাচারে ঢাকা পড়েছে। সেজন্যই দর্শন হয়েছে মতবাদের সমরাঙ্গন— যা দেখে কান্টের গ্লানিবোধ হয়েছিল। নইলে আমাদের এমন স্বচ্ছ নির্ধারিতার্থ শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে বার্কলির কি আপত্তি থাকতো বসুবন্ধুর সঙ্গে হাতমিলিয়ে আত্মখ্যাতিবাদী বলে পরিচিত হতে, না Multiple locationবাদী Whitehead-ই রামানুজীসৎখ্যাতিবাদ সমর্থন করবার লোভ সামলাতে পারতেন ? [২]

দুঃখের বিষয় দু-দেশের চিন্তাসমুদ্রের সুয়েজ কাটা হয়নি কিছুদিন আগে পর্যন্ত (সম্ভবতঃ আজো পর্যন্ত)। আর তাই ‘থীটিটাসে’র সঙ্গে বাক্যালাপে সক্রেটিসের অমন প্রসন্নগম্ভীর অপ্রমার আলোচনার মধ্যে থেকেও আমরা স্পষ্ট কোনো খ্যাতিবাদের নির্দেশ পেতে পেতেও পেলাম না। বর্তমান নিবন্ধে সক্রেটিস্, অ্যালেক্‌জাণ্ডার ও রাসেলের খ্যাতিবাদের সামান্য আলোচনা করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ও প্রাচ্য খ্যাতিবাদগুলির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ বিচার করার নামমাত্র চেষ্টা করা হবে।

---

(২) এই তুলনা ওপর-ওপর।

* * * * * *

সক্রেটিসের বিচারধারাটি ['থীটিটাস্' ১৮৮—১৯৮] নিম্নরূপ ঃ—

যে কোনও বিষয় হয় জ্ঞাত নয় অজ্ঞাত [জ্ঞাত=known=প্রমিত] ; যা জ্ঞাত তা অজ্ঞাত নয় এবং যা অজ্ঞাত তাকে কখনই জ্ঞাত বলা যায় না [সমকালে]। সুতরাং যেকোনও দুটি বিষয়ের হয় উভয়ই জ্ঞাত, নয় উভয়ই অজ্ঞাত, নয় একটি জ্ঞাত অপরটি অজ্ঞাত হতে পারে। যদি দুটি বিষয়ই জ্ঞাত হয় তাহলে একটিকে আরেকটি বলে জানা সম্ভব নয়। যদি দুটিই অজ্ঞাত হয় তাহলেও একটিকে আরেকটি বলে জানা সম্ভব নয়। আবার যদি যে কোনো একটি জ্ঞাত এবং অপরটি অজ্ঞাত হয় তাহলেও একটিকে অপরটি বলে জানা সম্ভব নয়। অথচ এছাড়া কোনো চতুর্থ বিকল্পও নেই। এবং একটি বিষয়কে অপরটি বলে না জানলে ভুল জানাই বা কী করে হয় ?

আবার আরেক দিক থেকেও দেখানো যায় যে 'ভুল জানা' ব্যাপারটা অসম্ভব। যেহেতু কেবল তখনই আমরা বলি যে, কোনো লোক ভুল জান্‌ছে বা দেখ্‌ছে বা ভাবছে, যখন সে যা জান্‌ছে বা ভাবছে বা দেখ্‌ছে তা আসলে নেই। কিন্তু যা আসলে নেই তা কি কেউ ভাবতে বা দেখতে বা জানতে পারে ? আপাতত মনে হয়, পারে তো বটেই নইলে আর আমরা মরীচিকা, জলের মধ্যে সোজা লাঠির অধ্যস্ত বক্রতা এসব দেখি কি করে ? কিন্তু সক্রেটিস্ যুক্তি যোজনা করছেন—

যদি কেউ ভাবে তাহলে সেতো কিছু একটা ভাবছে। এবং কিছু একটা ভাবা মানেই তো এমন কিছুকে ভাবা, যা আছে। তাহলে যা নেই তাকে ভাবা মানে কিছু না ভাবা এবং তার মানে একদম না ভাবা। তাহলে কোনো দ্রব্যই হোক বা গুণই হোক—বিশেষ্যই হোক আর বিশেষণই হোক এমন কিছু ভাবা সম্ভব নয় যা কিছু নয়। অর্থাৎ হয় ভাবব এবং এমন কিছু ভাবব যা আছে সুতরাং ভাবনাটা হবে সত্য কেননা সদ্বিষয়ক, নইলে ভাব্‌বই না। কিন্তু তাহলে ভুল ভাবা জিনিসটার সম্ভাবনাই নেই। আধুনিক লজিকের প্রতীক ব্যবহার করলে সক্রেটিস্ চাতুরী করে "S is thinking something which is not there" একে পরিণত করেছেন এই রকম একটি স্ববিরোধী বাক্যে "(∃x) [(x does not exist). (x is being thought by S)] যা ভাবা সম্পর্কে বলা হল তা দেখা, ছোঁয়া, বিশ্বাস করা, জানা—সব কিছু সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

এই বিচিত্র বাক্‌ছলে বিভ্রান্ত থীটিটাস্‌কে আশ্বস্ত করে দয়ালু ধাত্রীর বেশে এগিয়ে এসেছেন সক্রেটিস্ পরবর্তী পর্যায়ের কথোপকথনে। যে ত্রিকোটিক বিকল্প সাহায্যে পূর্বে অপ্রমার সম্ভাবনা নিরস্ত হয়েছিল—তার মধ্যে একটি ফাঁকি ছিল। "জানা" ব্যাপারটার অনেক স্তরভেদ আছে তাই 'জ্ঞাত' বা 'জ্ঞায়মান' এই কথার বিভিন্ন অর্থ হ'তে পারে। যখন দড়িকে সাপ বলে ভাবি তখন এক অর্থে সাপ ও দড়ি দুটিই আমার জ্ঞাত, কেননা কাকে সাপ বলে ও কাকে দড়ি বলে দুই-ই আমার

জানা। সক্রেটিসেরই করা একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরে বল্‌তে পারি, "Though I am not *having* knowledge of both I *possess* a knowledge of both" ।

আবার এক অর্থে আমরা দড়িটিকেও জান্‌ছিনা [কেননা সেটিতো ভাস্‌ছেই না—অর্থাৎ জ্ঞানের বিশেষ্যভূত হচ্ছেই না] এবং সাপটিকেও জানছি না [যদি জানা মানে ধরি "to know", অর্থাৎ ঠিক্ জানা]। আবার এক অর্থে আমরা সাপটিকে জানছি (মানে, দেখছি) কিন্তু দড়িটিকে জানছি না। এবং এক অর্থে দড়িটিকেই জানছি (বস্তুত আমার জ্ঞানটার অধিষ্ঠান দড়ি) কিন্তু সাপটিকে জানছি না (মাত্র ভুল করে ভাবছি যে সাপটি আছে)।

এই ভাবে অবাস্তব বলে প্রতীয়মান তিনটি (বা চারটি) বিকল্প সম্ভাবনাই "জানা" শব্দের অস্পষ্টার্থতার সুযোগ নিয়ে ভ্রমকালে যেন বাস্তবায়িত হয়। [এই বিকল্পনাগুলি সক্রেটিসের নয়, আমার।]

তাই দ্বিতীয় স্তরে সক্রেটিস্ আরো ভেঙে বলছেন যে "যাকে আমরা জ্ঞাত বলে মনে করি তাকেই আবার অজ্ঞাত বলে জানতে পারি"—এই সম্ভাবনাটা নাকচ করে আমরা ঠিক করিনি। মানুষের মনে বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষজন্য সংস্কার একটি স্মৃতির মোম-ফলকে [Waxen-block of Memory] মুদ্রিত হয়ে থাকে। যদি সেই সংস্কারের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষানুভব খাপে খাপে মিলে যায় তাহলেই "এই সেই দেবদত্ত" গোছের প্রত্যাভিজ্ঞা হয়। কোনো জিনিস জানবার বা চেনবার সময়ে আমরা প্রায়ই অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্টভাবে [কোন জিনিসের সবটা একসঙ্গে তো দেখতে পারাই সম্ভব নয়] হয়তো বা দূর থেকে দেখে সেই সামান্য অভিজ্ঞতা জন্য ইন্দ্রিয়-উপাত্তগুলি ঠিক কোন্ সংস্কারের খাপে ঠিক ঠিক বসবে তা হাতড়াতে থাকি। যদি খাপ ঠিক মিলে যায় তাহলে ফল হয় প্রমা, আর যদি এক খোপের যোগ্য ইন্দ্রিয়-উপাত্ত [মানে যে জিনিসের সংস্কার তারই পাঠানো ইন্দ্রিয়-উপাত্ত] অন্য খোপে [অন্য জিনিসের সংস্কারে] বদ্‌লাবদ্‌লি হয়ে যায় তার থেকে যে বৈষম্য বা Heterodoxy হয় তাকেই আমরা বলি "ভুল জানা··· [বা দেখা বা বিশ্বাস করা···]"। অবশ্য এই কথা বলার আগে সক্রেটিস্ একটি অত্যন্ত জটিল ও বিস্তারিত তালিকা দিয়েছেন সেই সব সম্ভাব্য ক্ষেত্রের যেখানে দুটো বিষয়ের মধ্যে পরস্পরাধ্যাস সম্ভব নয়। যেমন, যদি রাম ও শ্যাম দুজনকেই আমি জানি, মানে চিনি, কিন্তু তাদের কেউই আমার ইন্দ্রিয় সন্নিহিত না হয়, তাহলে খামখা তাদের গুলিয়ে ফেলতে পারি না, তেমনি দুজনেই যদি ইন্দ্রিয় সন্নিহিত হয় এবং তাদের যে সংস্কারচিত্র আমার স্মৃতিতে আছে তার সঙ্গে তাদের অধুনাদৃষ্ট প্রত্যক্ষ রূপ ঠিক ঠিক খাপে খাপে বসে যায়, তাহলেও সক্রেটিস্ বলছেন, আমরা তাদেরকে গুলিয়ে ফেলতে পারি না। তেমনি দুজনের একজনকে যদি চিনি আরেকজনকে না চিনি কিংবা দুজনকেই না চিনি তাহলেও তাদেরকে সামনে পেলে বা না পেলে গুলিয়ে ফেলতে পারি না। এই রকম বাদ দিতে দিতে দেখা গেছে যে কেবল সে সব ক্ষেত্রেই আমরা রামকে শ্যাম [বা ব্যত্যস্ত] বলে ভুল করতে পারি যখন দুজনেই আমাদের পূর্বদৃষ্ট [বা পরিচিত] এবং একজন, রাম, ইন্দ্রিয় সন্নিহিত। কিন্তু রামকে ভাল করে না দেখবার ফলে তার সঙ্গে আমার ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত যে প্রদত্ত

অনুভব স্মৃতির শেল্‌ফে এখনও তার ঠিক খোপটি খুঁজে পাইনি, অর্থাৎ তাকে বিশেষভাবে সর্বলক্ষণান্বিত করে একবারে দেখিনি—নৈয়ায়িকের মত বলতে ইচ্ছে করছে—‘ইদন্তা’র জ্ঞানমাত্র হয়েছে—কিন্তু হায় সক্রেটিস্ তা বলেননি—মোটমাট রামকে যেটুকু দেখেছি তাতে শ্যামবাবুর সংস্কারের খাপে তার আবছায়া ছবিকে ঢুকিয়ে ফেলতে পারি—এরকম অবস্থাতেই ‘ভুল—জানা’ সম্ভব।

একদম আলাদা একটি প্রসঙ্গে Strawson-এর Bounds of Sense-এর একটি উজ্জ্বল ভাষা ধার করে বলতে লোভ হচ্ছে। ভ্রম বিষয়ে এই আলোচনা যতটা না Explanation তার চেয়ে বেশী Story। তবু এর Explanation অংশে নিম্নলিখিত সচেতনতাগুলি স্পষ্ট ঃ—

১। সক্রেটিস্ অখ্যাতিবাদী নন। ভ্রমজ্ঞানকে বিবেকাগ্রহ জাতীয় অর্থাৎ জ্ঞানাভাব বলে তিনি ওড়াতে চান্‌না—একটা পৃথক জ্ঞান বলেই স্বীকার করেন। বলা বাহুল্য ‘ভ্রমজ্ঞান’ শব্দের জ্ঞান মানে knowledge নয় opinion এবং এই opinion-এর সবিকল্পকতা বোঝাতে গিয়ে উনি প্রায় Wittgenstein-এর মত বলেছেন, “To form an opinion is to speak (to oneself)। অর্থাৎ মিথ্যা opinion যখন আমাদের হয় তখন আমরা একটি তদভাববান্ বিষয়ে তৎপ্রকারক বাক্য, যেন নিজেদের জন্য, রচনা করি—চিন্তার নিঃশব্দ ভাষায়। সুতরাং শুক্তিরজত ভ্রমে “ইদং রজতং” ইত্যাকারে অভিলাপ্য জ্ঞানই আমাদের হয়—এটাই তাঁর মত।

২। সক্রেটিস্ অসৎখ্যাতিবাদীও নন্। ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের সত্তাটা কি জাতীয় [অর্থাৎ তা সৎ, না অসৎ, না ভাবনাত্মক, না সদসদনির্বচনীয়] এ প্রশ্ন তিনি বুঝতে দেননি—কেন, তা পরে বলছি। কিন্তু ভ্রমের বিষয়টা অসৎ মানে নেই একথা তিনি বলবেন না বলেই মনে হয় ; কেননা তিনি পূর্বেই মেনেছেন “To think is to think something and therefore of something that is” এর সঙ্গে ভ্রমজ্ঞানের উপপত্তি করতে গিয়ে তিনি নৈয়ায়িকের মত দেশান্তরীয় কালান্তরীয় জ্ঞানলক্ষণ-প্রত্যাসত্তিদ্বারা ইন্দ্রিয় সম্বদ্ধ বিষয়ের কথা বলবেন না কি অধিষ্ঠান-আবরক কোনো সদসদনির্বচনীয় twilight Eixstence-এর কথা বলবেন তা বলা যায় না। অবশ্য যদি মুখের কথা ধরা যায় তাহলে উনি অন্যথাখ্যাতিবাদী এবং ভ্রমের বিষয়কে অন্যত্র সৎ বলে মানেন, যথা—“false opinion is a sort of heterodoxy ; a person may make an exchange in mind and say that one real object is another real object, for thus he always thinks *that which is*, but he puts one thing in the place of another.”[৩] Thing আর ধর্মের তফাৎ উপেক্ষা করলে এ একেবারে “অন্যত্র অন্য ধর্মাধ্যাস”-এর প্রতিধ্বনি।

আবার অন্যদিকে শংকরের নিজস্ব যে অধ্যাসলক্ষণ তার ওপরে সাম্প্রদায়িক কসরত না করলে সক্রেটিসের সঙ্গে তা-ও মিলে যায়। তিনিও বলেছেন স্মৃতিরই মত রূপ বিশিষ্ট অর্থাৎ অসন্নিহিত বিষয়কতাবশিষ্ট (having for its object something that is not presented) পরত্র অর্থাৎ কোনো প্রদত্ত (আপেক্ষিক) সদবস্তুতে পূর্বদৃষ্ট পদার্থে'র যে আভাস তাই অধ্যাস। বস্তুতঃ অসৎ, আত্ম ও অখ্যাতি ছাড়া বাকী সকলেই সক্রেটিসের কথা (জান্‌লে) মানতেন।

---

(৩) এই সমস্ত ইংরিজী উদ্ধৃতি Jowett সাহেবের Plato-র *Dialogue*-এর অনুবাদের বৃহৎ দ্বিখণ্ড Random House সংস্করণ থেকে।

৩। কিন্তু প্রাচ্য দার্শনিকদের মত "ভ্রমজ্ঞানের **বিষয়টা** কিংস্বরূপ ?"—এ প্রশ্ন সক্রেটিস্ তুলতে দেন্‌নি কারণ তাঁর প্রদত্ত বিশ্লেষণ অনুযায় ভ্রমের সেরকম **একটি** কোন বিষয়ে থাকে না। [একথা বলার জন্য অবশ্য তাঁকে এও বল্‌তে হবে যে কোনও সবিকল্পক জ্ঞানেরই ঐকিক বিষয় থাকে না, যেমন সাক্ষাৎকৃতির অর্থাৎ নিষ্প্রকারক প্রত্যক্ষের থাকে।] রাসেল তাঁর 'প্রব্লেম্‌স্' বইয়ে খুব যেন আবিষ্কারকের মত বলেছেন যে অপ্রমার ব্যাখ্যা দিতে হলে জ্ঞান নামক সম্বন্ধটাকে দ্বিপদী অর্থাৎ একটি জ্ঞাতা ও একটি জ্ঞেয়—এরকম ভাবা চল্‌বে না। "একটা কিছু" যার বিষয়ে বিশ্বাস বা অনুভব জন্মায়—এ রকম কিছু খুঁজলে ভ্রমানুভবের ক্ষেত্রে অস্তিত্বশীল অলীকের (Existent falsehood) খোঁজ করতে হবে—এবং তাহলেই স্ববিরোধ দেখা দেবে।[৪] কিন্তু সক্রেটিস্ বহুকাল আগেই একথা বুঝেছিলেন, তাই অপ্রমার ব্যাখ্যা হিসেবে "এমন **একটা** কিছুর জ্ঞান, যা নেই"—এই জাতীয় বিশ্লেষণকে তিনি পরিহার করেছেন।

ঠিক রাসেল যেভাবে ঐকিক object-এর বদলে object-complex বসিয়ে তার মধ্যে একটি object-relation প্রবেশ করিয়ে সেই relation-এর দিগ্‌বিপর্যয়কেই ভ্রমের কারণ বলে বর্ণনা দিয়েছেন, সক্রেটিস্ তেমনি ভ্রমের ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজনে জ্ঞানের বিষয় করেছেন সংস্কার ও ইন্দ্রিয়-উপাত্তের একটি যৌগ-সংঘাতকে—যার মধ্যেকার সংগতি যথাযথভাবে অর্থাৎ বাস্তবানুগভাবে জ্ঞানগঠনে পুনঃপ্রবর্তিত হলে পরে হয় প্রথা আর জ্ঞানগঠনে তার পুনঃপ্রবর্তনায় যদি সংগতির বিপর্যয় হয় তাহলে হয় অপ্রমা।

মোটামুটিভাবে একটি সচেতনতা সক্রেটিস্ ও রাসেল দুজনেই দেখিয়েছেন যে ভ্রমকে ব্যাখ্যা করতে হলে সবিকল্পক অনুভবের বিষয়কে হতে হবে যৌগ এবং এমন যৌগ যার মধ্যেকার সম্বন্ধটি মনের দ্বারা বিক্ষেপণীয়। প্রায় সমজাতীয় কথা আলেক্‌জাণ্ডারও বলেছেন যে ভ্রমকালে "The mind interferes with the world of objects and disarranges it"—কিন্তু মন যে world-কে disarrange করতে পারে তা কি অর্থে world of objects ? অন্তত তা মানস-নিরপেক্ষ object-এর জগৎ নয়। আর যদি তাই না হয় তাহলে Realist-দের সেই বহুবাঞ্ছিত—বহির্জগতের দ্বারা সম্পূর্ণ নিরূপিত, নিষ্ক্রিয় মনের পর্দায় জোর করে চাপিয়ে দেওয়া প্রত্যক্ষের givenness থাকে কি ? ভ্রম-কালেই কি আমরা ভাসমান সাপকে বহিঃপ্রদত্ত ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতে পারি ?

তাই মনে হয় রাসেলের মত সমন্বয় করা সম্ভব যদি তার সঙ্গে ব্র্যাডলির "বিশ্লেষণ-পুরঃসর পুনর্গঠন"—judgement বিষয়ক এই থিয়োরী যোগ করা হয়। অর্থাৎ ঘটনার জগতে একটি object-complex নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বিরাজমান। জ্ঞাতৃচিত্ত তাকে জান্‌বার সময়ে ভাগ ভাগ করে term হিসেবে জানল—এ জানা knowledge of thing—এতে মিথ্যাত্বের অবকাশ নেই।

---

(৪) "The necessity of allowing for falsehood makes it impossible to regard belief as a relation of the mind to a single object which could be said to be *what is believed.*" (*Problems,* Chap. XII)

অবশেষে বিশ্বাস-গঠনকালে সেগুলিকে আবার জ্ঞানাকারে আকারিত করে যখন দ্বিতীয় object-complex বা আমি বলব content-complex তৈরী করল তখনই object-relation-এর দিগ্‌বিপর্যয় হবার সম্ভাবনা। এই পুনর্গঠিত বিষয়যোগের মধ্যেই মনের disarrange করবার প্রক্রিয়ার, ঘাটনিক বিষয়যোগ—যা হ'ল জ্ঞানটির প্রদত্ত প্রযোজক—তার মধ্যে নয়। এই পুনর্গঠনের কথাই লক্‌ ভেবেছিলেন যখন তিনি জ্ঞানকালে মনকে লিখনহীন শ্লেটের মত বললেও জ্ঞানক্রিয়াতে 'comparison of ideas' জাতীয় একটি মানসক্রিয়ার ভূমিকা স্বীকার করেছিলেন।

আরেকটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে Explanation একই ধরনের হলেও রাসেলের Story সক্রেটিসের Story থেকে আলাদা। ছবি দিয়ে যদি বোঝাই—

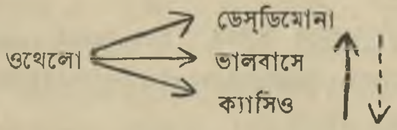
ডেস্‌ডিমোনা
ওথেলো
ভালবাসে
ক্যাসিও

[অস্পষ্ট তীর—সম্বন্ধের দিগ্‌বিপর্যয় সূচনা করে]

কিন্তু এই ছবির প্রথমেই দুটি দোষ চোখে পড়ে

১। আরো প্রাথমিক ধরনের ভ্রম যেমন রজ্জুসর্পের বেলায় এ ছবি কি করে প্রযোজ্য হবে বলা মুস্কিল। দড়িকে সাপ ভাবার মধ্যে কোথায় object-relation ও তার sense বা direction লুকিয়ে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

২। ওথেলো ও বস্তুজগতের ডেস্‌ডিমোনা, ভালবাসা ও ক্যাসিওর মধ্যেখানে একটি মাঝামাঝি বুদ্ধিনির্মাণের জগৎ স্বীকার না করলে দিগ্‌ভ্রান্ত 'ভালবাসা' সম্বন্ধটি কে কোথায় স্থাপন করবো? ঘটনায় তো আর ভালবাসার দিগ্‌বিপর্যয় করবার ক্ষমতা বা দরকার মনের নেই।

এবার দেখা সক্রেটিসের ছবিটি কি রকম। যাক উনি আলোচনা করেছেন শুক্তিতে "ইহা রজত" এই জাতীয় প্রাথমিক দৃষ্টিভ্রমের দৃষ্টান্ত নিয়ে। ওঁর নিজস্ব দৃষ্টান্ত হল থীটিটাস্‌কে দেখে থিওডোরাস্‌ বলে ভুল করা।

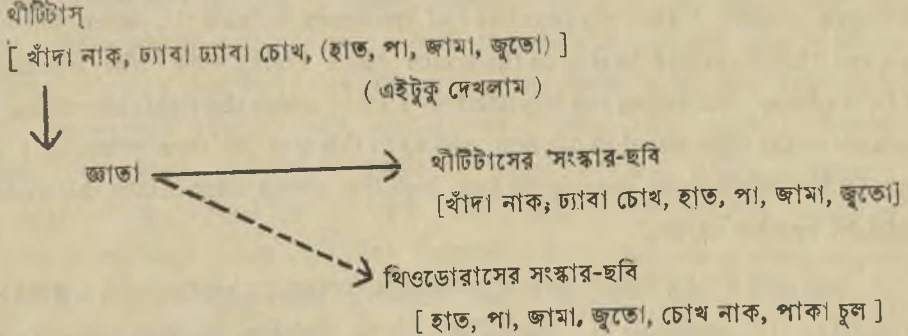
থীটিটাস্‌
[খাঁদা নাক, ড্যাবা ড্যাবা চোখ, (হাত, পা, জামা, জুতো)]
(এইটুকু দেখলাম)
জ্ঞাতা
থীটিটাসের 'সংস্কার-ছবি
[খাঁদা নাক; ড্যাবা চোখ, হাত, পা, জামা, জুতো]
থিওডোরাসের সংস্কার-ছবি
[হাত, পা, জামা, জুতো, চোখ নাক, পাকা চুল]

ধরলাম, 'থীটিটাস্‌' জ্ঞাতার ইন্দ্রিয় সন্নিহিত হল। কিন্তু তার সব গুণগুলি চোখে পড়ল না, মনের অনবধান, ইন্দ্রিয় দোষ, বা অন্তবর্তী আবহের অস্বাভাবিকতার জন্য কয়েকটি ভাসল, কয়েকটি

ঢেকে গেল। [উপরন্তু আবরনের ওপরে হয়তো একটু বিক্ষেপও হয়ে গেল—যা থীটিটাসের নেই সেই পাকাচুল ও দূর থেকে তার আছে বলে ভাসল]। এদিকে জ্ঞাতার মনের ভেতরে পূর্বদৃষ্ট থীটিটাস্ ও থিওডোরাস্ দুজনেরই সংস্কার ছবি আছে—এবং তাদের মধ্যে সাধারণ হল হাত, পা, জামা, জুতো—যেটুকু মাত্র এখন প্রত্যক্ষলব্ধ হয়েছে। সুতরাং মাত্র এই সাধারণ গুণগুলি দেখে যদি আমরা থীটিটাসের সংস্কার ছবির সঙ্গেই প্রতক্ষটিকে যোজনা করতে পারি তাহলে হবে যথার্থানুভব। আর যদি ভুল করে মাত্র হাত পা জামা জুতো দেখে থিওডোরাসের সংস্কার ছবির সঙ্গে তাকে যোগ করি তাহলে আমি থীটিটাসের মধ্যে আশা করব চোখা নাক ও পাকা চুল—এবং কাছে আসলে তা না পেয়ে বুঝব যে আমার অনুভবটা হয়েছিল অযথার্থ—অর্থাৎ তদভাববান্ থীটিটাসের বিষয়ে তৎপ্রকারক অনুভব [যেখানে তৎ=থিওডোরাসত্ব]।

হুবহু এই কথাই প্রতিধ্বনিত আলেক্‌জাণ্ডারের ঝলমলে ভাষায়, "The mind squints at things and one thing is seen with the characters, of something else"—উপরের চিত্রের অস্পষ্ট বেঁকে যাওয়া তীরটি জ্ঞাতার এই ট্যারা দৃষ্টিরই সূচনা করে না কি ?

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ভ্রম প্রত্যক্ষের মত যথার্থপ্রত্যক্ষ ও স্মৃতি ও সংবেদনের মিশ্রণ। অর্ধ-সংবেদিত বিষয়ের সঙ্গে পূর্বদৃস্টাবভাস-এর মিশেল দিয়েই তৈরী হয় আমাদের অধিকাংশ প্রত্যক্ষ। এমনি একটি পরিপূরণের দৃষ্টান্ত চেয়ারের না-দেখা চতুর্থ পায়া যাকে দেখি বলে মনে হয়। তাই পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাস ঃ মাত্র বললে এই লক্ষণ প্রমাতে অতি ব্যপ্ত হয়। স্মৃতিরূপতাই এখানে অবচ্ছেদক। যেহেতু প্রমা আর অপ্রমার মধ্যে, প্রবৃত্তিসামর্থ্যর কথা বাদ দিলে পার্থক্য একটাই ঃ একটি সন্নিহিতবিষয়ক (has a presented object for its content) আর অন্যটি স্মৃতির মত অসন্নিহিত বিষয়ক (has an unpresented object for its content)।—এসব কথা ভামতীকার খুব স্পষ্ট করে বলেছেন।

সমাপ্তিতে সক্রেটিস্ ও আলেক্‌জাণ্ডারের অ-প্রমাবিষয়ক উক্তি পাশাপাশি বসিয়ে আমরা দেখব কিভাবে পশ্চিমের চিন্তাতেও অজান্তে একটি সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যানুগতা এসে পড়েছে। সক্রেটিস্ থীটিটাস্‌কে বলেছেন, "The only possibility of erroneous opinion is, when knowing you and Theodorus and having on the waxen block [স্মৃতির ফলক] the impression of both of you···but seeing you imperfectly···I try to assign the right impression of memory to the right visual impression and to fit this into its own print...if I fail and TRANSPOSE them, putting the foot into the wrong shoe,...then heterodoxy and false opinion ensues."

হুবহু একই ধাতুরূপ ব্যবহার করে আলেক্‌জাণ্ডার বলেছেন, "The illusion is a TRANSPOSITION of materials"। সক্রেটিসের "false opinion is heterodoxy" আর আলেক্‌জাণ্ডারের "Error is reality seen away" পড়ে কি মনে হয় না যে দুজনেই কোনও ধরনের বিপরীত খ্যাতির কথা ভাবছিলেন ?

পূনশ্চ ঃ—

"অন্যথাখ্যাতি" হবার জন্য সক্রেটিসের ব্যাখ্যার একটিই সম্পূরণ প্রয়োজন ঃ তাঁকে 'জ্ঞানলক্ষণটি প্রত্যাসত্তি' মানতে হবে। সক্রেটিস্ বলেছেন যে সত্য বা মিথ্যাভাবে (যথাক্রমে x বা y বিষয়ে) "এটা x" এই আকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন আমাদের হয় তখন ঐ জ্ঞান প্রকারটি অর্থাৎ "x-ত্ব" কিছুটা প্রদত্ত কিছুটা পূর্বদৃষ্টাবভাস। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই প্রত্যক্ষ মিশে থাকা পূর্বদৃষ্টাভাসে স্মৃতির মত "পূর্বদৃষ্টত্বের চিহ্ন" নেই (অর্থাৎ প্রাভাকররা যাকে বলেছেন প্রদৃষ্ট-তত্তাক-স্মৃতি)। স্মৃতির বিষয়টা যেমন অতীত-কালীয় বলে চিনতে পারা যায় এই সংবেদন-পরিপূরক স্মৃতিতে কিন্তু মনে হয় বিষয়টা বুঝি ইহকালস্থ ইহদেশস্থ। কেননা [রূপো বা ঝিনুক বিষয়ে] প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা তো আর ঐ রকম হয় না যে ঃ "ঝকৃঝকে দেখে তো মনে পড়ছে সেই সেদিন সেখানে দেখা রূপোর কথা"—জ্ঞানটা হয় এই রকম ঃ "ওই তো এক টুকরো রূপো পড়ে আছে।" [সুতরাং জ্ঞানের ভাসমান বিষয় বা প্রাতীতিক বিষয় হয় "রূপো"ই "রূপোর স্মৃতিচিত্র" নয়—যদিও চিত্তস্থ রূপোর স্মৃতিচিত্রের মাধ্যমেই অন্যস্থানে অন্যকালে দেখা রূপোর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যেন এক্ষেত্রে একটা অসাধারণ সংযোগ স্থাপিত হয়। সংযোগটা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই হয় মধ্যে যতগুলিই অন্তর্বর্তী যোগসূত্র থাক না কেন, যেহেতু সত্যি বা মিথ্যে করে হোক ভাসমান রূপোটা আমরা স্পষ্ট চোখে দেখি [আসলে চোখে দেখি কিনা সেটা অপ্রাসঙ্গিক, যেহেতু ভাসমান বিষয়ের আলোচনায় অনুব্যবসায়ের সাক্ষ্যই চরম—বস্তুতঃ প্রতীতির বাইরে যে 'আসল'—সেটা তো লোকব্যবহারে একটা স্থাপনা—তাই না ?]

তাই রাসেল-ও যখন Knowledge by Aquaintance-এর একটা প্রকার হিসাবে Memory-কে ধরেছেন তখন তজ্জাতীয় সাক্ষাৎকৃতির বিষয় হিসাবে Memory-Image-কে ধরেননি, ধরেছেন স্মৃত ঘটনা বা বস্তুকেই। সুতরাং স্মরণের মাধ্যমে আমাদের যে প্রত্যক্ষভাবে দেশান্তরীয় কালান্তরীয় বস্তুরই সাক্ষাতকৃতি হতে পারে এ কথা রাসেল অন্তত মানেন। সক্রেটিসও, ধরা যেতে পারে, এ কথা (প্রশ্ন উঠলে) মেনে নিতেন যে মিথ্যা জ্ঞানে বিপরীত সংস্কার চিত্রের মাধ্যমে দেশান্তরীয় কালান্তরীয় বিপরীত বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয় [বিপরীত=অন্য ≠ উল্‌টো] এবং এই বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগকেই নৈয়ায়িক জ্ঞানলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি বলেছেন। এই ধরনের প্রত্যাসত্তি আমাদের স্মরণে ও স্মরণাক্ত প্রত্যক্ষের [যথা ঃ "কচি লেবুপাতার মত নরম সবুজ রোদ্দুরে পৃথিবী ভরে গিয়েছে"……"টক টক গন্ধ"] ক্ষেত্রেও হয়, কেবল সেগুলি যথার্থ হলে অপ্রত্যাক্ষিত গুণগুলির প্রত্যাশা পরিপূরণীয়, অন্যথায়, এই প্রত্যাশা প্রত্যাহত হয়। ন্যায়ের প্রতিপক্ষীয় দার্শনিকরা ভয় দেখান জ্ঞানলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি মানলে অনুমানের পৃথক প্রমাণতার উচ্ছেদ হয়। এই কথা ভেবে ওই আপাতত উদ্ভট শুনতে কথাটি আমাদের সক্রেটিসের ঘাড়ে চাপাতে বাধছিল। কিন্তু স্মৃতি স্বরূপ বিশ্লেষণে রাসেলের *Problems of Philosophy*-র সমর্থন পেয়ে এবং সক্রেটিসের ভ্রমজ্ঞানের বিষয়কে Real বলবার অথচ (here) Unpresented স্বীকার করার যুগপৎ প্রয়াস [যার থেকে পরিষ্কার ন্যায় অনুমিতি হবে—"উক্ত বিষয় Elsewhere real —অন্যত্র সৎ] দেখে মনে হচ্ছে সক্রেটিস্ এই "অন্যথাখ্যাতির" তক্‌মায় খুব একটা অস্বস্তি বোধ করতেন না।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি

তুষারকান্তি ষন্নিগ্রহী

একথা আজকের দিনে অনস্বীকার্য যে সংস্কৃতিই হচ্ছে মানব সমাজের ধারক ও বাহক, কল্যাণহেতু আনন্দের উৎস এবং সভ্যতার প্রাণরূপ। প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত মানব সমাজ জীবন সংগ্রামে জয় পরাজয়ের অভিব্যক্তি : শোক, জরা, ভয়, মৃত্যু প্রভৃতির নিরসনকল্পে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর লৌকিক পূজার মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সেটাই লোকসংস্কৃতি। পল্লীপ্রধান বাংলার বুকে লোকসংস্কৃতি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থার উপর পরিবর্তিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব খুবই ব্যাপক ও আকর্ষণীয়। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে সাঁওতাল, মাঝি, মুণ্ডা, ওঁরাও ও ভূমিজ শ্রেণীর মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন। এছাড়া রয়েছেন নিম্ন ও কিছু উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ও মানবিক পরিবেশে এই দুটি জেলাতে যে লোকসংস্কৃতির সন্ধান মেলে তা প্রকৃতপক্ষে মিশ্র ধরনের। এই এলাকার সামাজিক আচার, ব্যবহার, ভাবধারা ও ভাষা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির চাইতে কিছুটা ভিন্ন এবং তা দিয়েই পরিপুষ্ট হয়েছে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি। জেলাগুলির অধিবাসীগণ ভাদু উৎসব ও টুসু উৎসব বেশ জাঁকজমক সহকারে পালন করেন। পাহাড়ী অঞ্চলে কিম্বা অন্য স্থানে যে সব আদিবাসী বাস করেন তাঁরা করম দেবতা, সারুল, গেরাম দেবতা, জাওয়া প্রভৃতির পূজা করে নিজেদের ধর্মকে প্রাধান্য দেন। এছাড়া এই অঞ্চলে ইঁদ পূজা, চড়ক পূজা, মনসা পূজা, বাঁধনা পরব বা গো-উৎসব এবং ছাতা পূজা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। আর পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য যে এক প্রধান উৎসব সে কথা অনেকেরই জানা।

* * * * *

ভাদ্র মাসে ভাদু পূজা এই অঞ্চলে বেশ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। মাটির মূর্তিকে কেন্দ্র করে

এই উৎসব। কথিত আছে পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহের এক মাত্র কন্যা ছিলেন ভদ্রেশ্বরী। তাঁকে সবাই ভাদু বলেই ডাকত। রূপে গুণে তাঁর সমকক্ষ কেউই ছিল না। সবাই তাঁকে দেবী-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরমাসুন্দরী রাজকন্যা—ভাদু দিন-দিন বড় হতে লাগলেন, ক্রমে বিবাহ-যোগ্যা হলেন। কন্যার জন্য সুপাত্রের সন্ধানে রাজা দেশ বিদেশে পাড়ি দিলেন। রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর নাম তখন রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর রূপ ও গুণের কথা শুনে তাঁকে বিবাহ করতে কে না খুশী হবেন? কিন্তু না। বিধাতার নির্বন্ধে তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এল। ভাদুর শরীর দিন-দিন খারাপের দিকে যেতে লাগল। কত বদ্যি, কত ডাক্তার দেখানো হল, কিন্তু ফল কিছুই হল না; তাঁকে কিছুতেই রাখা গেল না। বিবাহের পূর্বেই জীবনদীপ নির্বাপিত হল। ভাদুর অকাল মৃত্যুর সংবাদে রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে এল। দিন কয়েক পরে শোকাহত রাজা স্থির করলেন যাতে তাঁর আদরের কন্যাকে প্রজারা স্মরণ রাখে, সেইজন্য তিনি ঘরে ঘরে ভাদু পূজার প্রচার করলেন। সেই থেকে সম্ভবত ভাদু উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

ভাদ্র মাসে ভাদুকে সবাই বরণ করে নেয়। মহিলাদের কণ্ঠে গীত হয় এক বিশেষ সুরে—

"ওমা ভদ্রেশ্বরী।
আমরা তোমায় ডাকছি মা বিনয় করি॥
তোমাধনে পূজব বলে গো, মনেতে মানস করি।
বেছে বেছে ফুল এনেছি সারা বন ঘুরি ঘুরি॥
ফুলের মালা, ফুলের ডালা গো, রেখেছি যতন করি।
ফুলের আসন পাতা আছে, বসবে মা তার উপরি॥
ফুলাসনে বসবে তুমি গো, আমরা দেখব মা নয়ন ভরি।
ফুলের চামর তুলাইব, আমরা যত সহচরি॥
ভক্তিভাবে করব পূজা গো, আমরা তোমার কিঙ্করী।
তোমার চরণ-পূজার ফুল রেখেছি এক সাজি ভর্তি করি॥"[১]

সারা ভাদ্র মাস ধরে পূজার পর সংক্রান্তির রাত্রে 'ভাদু জাগরণ' অনুষ্ঠিত হয়। তার পরদিন, পয়লা আশ্বিন, ভাদুর বিসর্জন হয়। ভাদু জাগরণ অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক পরিবারের ভাদু এক নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। বিভিন্ন দল সেই স্থানে আসেন মালা বদলের জন্য। প্রথম দল দরজা বন্ধ করে রাখেন, দরজার বাইরে থাকেন দ্বিতীয় দল। দুই দলের মধ্যে কথোপকথন চলে ভাদু-গানের মাধ্যমে। সে যেন এক কবির লড়াই! বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার উৎসবের আমেজকে মধুর করে তোলে। অবশেষে দরজা খোলা হয় এবং মালা বদল হয়ে যায়। কোন কোন সময় যে যাঁর নিজের ভাদুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন এবং অপরের ভাদুর খুব নিন্দা করতে থাকেন। কোন দল নিজেদের ভাদু সম্পর্কে হয়ত বলেন—

---

(১) কালীপদ কুণ্ডু

"ওলো নগরবাসী।
মোদের ভাদুর রূপ দেখে যা তোরা আসি॥
কিবা ভাদুর রূপের ছটা লো, কিবা লো রূপ রাশি।
বদন দেখে মনে হয় লো, শেষের ঠিক যেন গগন শশী॥
এমনি ভাদুর নয়ন দুটি লো, যেন ভ্রমরা আসে বসি।
হাতে পদ্ম, পায়ে পদ্ম, পদ্ম গন্ধে যায় ভাসি॥
মেঘের কোলে সৌদামিনী লো, জড়িতে মিশামিশী।
দেখলে জীবন জুড়াইবি, আনন্দে যাবি ভাসি॥
লক্ষ্মী বংশে জন্ম ভাদুর লো, পদধূলি নে আসি।
ভাদুর বরে কোলে করে, দেখবি চাঁদ মুখের হাসি॥"[২]

এই রূপবর্ণনকে ধিক্কার জানিয়ে অপর দল একই সুরে বলে উঠেন ঃ

"দেখছি হাতে সোনার চুড়ি।
তোদের ভাদুটা যে ঠিক যেমন মেথর বুড়ি॥
চুলগুলা যে উস্কুখুস্কা লো, ভর্তি নাকে পিচুড়ি।
গায়ের গন্ধে যায় না থাকা মনে হয় উঠে পড়ি॥
মাথায় বজ বজ করছে উকুন বেরাবে লো এক ঝুড়ি।
যা যা সবাই মিলে, মটকিই দিগা মট্ মট্ করে তাড়াতাড়ি॥
ভাদুর মুখটা দেখে মনে হয় যে লো, একশ বছরের বুড়ি।
একটিও দাঁত নাই যে বলি পেগলেই পেগলেই খায় মুড়ি॥"[৩]

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন ঘটে। ভাদুমণির অকালমৃত্যু একদিন ঘরে ঘরে শোক বহন করে এনেছিল, কিন্তু আজকের দিনে পূজার মাধ্যমে মানুষ তাঁকে যেন পুনর্জীবিত করে তুলেছে। ভাদু আজ দুঃখের বা হতাশার প্রতীক নন। তাঁকে নিয়ে তামাসা হয় ঃ

"ওলো ভাদু ডিয়ার।
মাইরি বলি রূপখানা তোর চমৎকার॥
সারা অঙ্গ ঢল ঢল লো, উঠে যৌবনের জোয়ার।
এমন রং ভারত জুড়ে দেখা যায় খুবই রেয়ার॥
মুক্তোর মত দাঁতগুলি যে লো, মাটিতে ঠেকে হেয়ার।
তোর বাঁকা চোখের চাহনিতে, ইচ্ছে হয় করি পেয়ার॥
রূপ দেখে তোর মজে গেছি লো বিশেষ বলব কি আর।
মোদের মত চ্যাংড়াদের তুই করবি কেন বল কেয়ার॥"[৪]

---

(২) মীরা দেবী (৩) কালীপদ কুণ্ডু (৪) মীরা দেবী

ভাদু গানের মধ্যে বর্তমান সমাজ কাল ও দেশের বাস্তব রূপ কোন কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেমন ঃ

“বলি এ সংসারে।
বিয়ের পণ যে বাড়ছে লো তিলে তিলে ॥
কলেজেতে পড়তে দিয়ে লো, এদিকে টাকা হাঁকে।
গরু বাছুরেরি দরে ছেলেকে বিক্রি করে ॥
টাকা নিয়ে আসছে বলি গো যত কনের বাবারে,
গরু, কাড়া কিনতে যেমন আমলাগুলির বাজারে।
দশ হাজার টাকা হেঁকে লো, যায় যে সব খদ্দারে।
টাকার লোভে ছেলের গলে ঘণ্টা বেঁধে দেয় বাপে ॥”[৫]

“হায় হায় একি হ’ল
ভুট্টো সাহেব এক চালে পড়ে গেল।
ইয়াহিয়ার কি যে মতি লো, সুখে খেতে ভূতে পেল।
তাই বোলতা চাকে কাঠি দিয়ে আপনি কামড় খেল ॥
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে লো দেশ প্রেমিক সব ছুটি এল।
(তারা) নরনারীর অত্যাচার যে দু’চোখে দেখতে পেল ॥
(তখন) মুক্তি সেনা নিয়ে তারা লো, প্রাণপণে লড়তে গেল।
ইয়াহিয়ার গুণ্ডা সেনার দু’দিনে পতন হ’ল ॥
দেশের জন্য লড়তে গিয়ে লো কত যুবক প্রাণ দিল।
তার ফলেতে নতুন রূপে বাংলাদেশ জন্ম নিল ॥”[৬]

পয়লা আশ্বিন ভাদু বিসর্জনের সুর আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়। গানের সুরে আগামী-বছর এমনি দিনে আবার যেন ভাদুমণিকে ফিরিয়ে আনা যায় তার শপথ নিয়ে সবাই ফিরে আসেন। ভাদ্র মাসের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত উৎসবের আনন্দ চলে।

মাটির ছোট মূর্তিকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়া জেলায় টুসু উৎসব সমারোহে পালিত হয়। যখন মাঠের ধান ঘরে ঘরে পূর্ণ, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসেই এই উৎসব। তাই আর্থিক দিক থেকে এই উৎসবের আনন্দে ভাটা পড়ে না বললেই চলে। উৎসবের জের পৌষ মাস পর্যন্ত চলে। গ্রাম-গঞ্জের মেয়েরা ঘরে ঘরে টুসু পূজা করে থাকেন। ভাদু গানের মত এক বিশেষ সুরে টুসু গান গীত হয়। টুসু গানের মধ্যেও পৌরাণিক কাহিনী থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সমাজের রূপরেখার ভাবধারা বিস্তৃত।

---

(৫) পরিক্ষীৎ মহান্তি (৬) রাজেন্দ্র প্রসাদ মহান্তি

রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, মিলনের কাহিনীকে কেন্দ্র করে কোন কোন সময় টুসু গান গীত হয়ে থাকে। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে এক টুসু গানে বলা হয়েছে,

> “চেয়ে দেখ লো তোরা কদমতলায় কে বটে মন চোরা।
> করে বাঁশী মুচকী হাসি লো চাহনি টেরা টেরা ॥
> (ও) তাঁর হাত-পাগুলো লাল টুকটুকে লো—
> পায়েতে নূপুর জোড়া।
> চেয়ে দেখ লো তোরা।”

প্রতি বৎসর টুসু উৎসবের এক গাজন ঝালদার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর তীরে জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়। উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গান ও নানা রকম আদব-কায়দা। এই উৎসবে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

সবুজের সমারোহে, আনন্দের দিনে আদিবাসীগণ তাঁদের করম দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। তাঁদের বিশ্বাস এই দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হতে পারে। বন থেকে সবুজ তাজা করম গাছের ডাল সংগ্রহ করে তা ঘরের আঙিনায় পুঁতে দেবতারূপে জ্ঞান করা হয়। তাকেই ঘিরে আদিবাসী রমণীগণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য ও গীত পরিবেশন করতে থাকেন। বিভিন্ন দল কর্তৃক দফায় দফায় নৃত্য ও গীত পরিবেশিত হয়ে কোন নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত তা চলে। এর পূর্বে কোন মতেই নৃত্য গীত বন্ধ রাখা চলে না। সারুল বা সারি পূজা সাঁওতালরা করেন। শালগাছে যখন ফুল ফুটে সেই সময় এক নির্দিষ্ট তিথিতে সারি উৎসব পালিত হয়। রমণীরা সারিবদ্ধভাবে হাতে হাত ধরে নৃত্য করেন আর পুরুষরা মাদল বাজান। শাল ফুল দিয়ে দেবতাকে অঞ্জলি দেওয়া হয়।

বিশেষ করে বনের মধ্যে বড় বড় শালগাছের নীচে আদিবাসীগণ কর্তৃক গেরাম দেবতা স্থাপিত হয়। গাছের গোড়ায় কিছু পাথর, পোড়ামাটির পুতুল, মাটির তৈরী হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি রেখে তাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়। পুরুষ আদিবাসী শিংয়ায় (শিং-এর বাঁশী) সুর তোলে আর রমণীরা নৃত্য করেন।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় সাপের উৎপাতের কথা সকলেরই জানা। এমন কোন বছর এ পর্যন্ত যায়নি যে বছরে সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটেনি। তাই বিষহরি মা মনসার পূজা একরকম সবাই করে থাকেন। মনসা পূজার সাথে সাথে ঝাঁপান উৎসব সত্যিই এক অসামান্য ব্যাপার। ‘ঝাঁপান’ হচ্ছে মৃত্যুর গান। অতি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে এই গান প্রচলিত হয়ে আসছে। সর্পদংশনে আসন্ন মৃত্যু ঘনিয়ে আসার সময়েই এই গান গাওয়া হত। মৃত্যুর গানও যে সুন্দর হতে পারে তা ঝাঁপান উৎসব দেখলেই বোঝা যায়। ঝাঁপান, বস্তুত পক্ষে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজস্ব মানসিক দৃঢ়তা দেখানোর অন্যতম নিদর্শন। অনেকে মনে করেন সর্প পূজার সাথে ঝাঁপান উৎসবের নামের একটা

ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে। সাপুড়েরা ঝাঁপির মধ্যে সাপ নিয়ে আসতেন বলে এই ঝাঁপি থেকে ঝাঁপান কথাটি এসেছে। এছাড়া খেলা দেখাবার সময় সর্পকুশলীরা সাপকে অনেকটা উঁচুতে ছুঁড়ে দিতেন। তারপর ঝাঁপিয়ে বা লাফিয়ে ধরে তাকে ঝাঁপির মধ্যে রাখতেন। হয়তো এই ঝাঁপিয়ে ধরা থেকেও ঝাঁপান কথাটি আসতে পারে।

সে যাই হোক, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ঝাঁপান উৎসব দেখলে অনেকেই ভীত ও চমকিত হবেন। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই উৎসব হয়। শোনা যায়, মল্লরাজাদের আমলে সাপুড়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। এতে সর্পকুশলীদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। এখন আর সেরকমটা হয় না।

কাঠের মাচার উপরে বসে সর্পবিশারদরা কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, গান করেন, বিভিন্ন সাপ নিয়ে খেলান এবং নানা আদব-কায়দা পরিবেশন করেন। কোন কোন সময় বিশারদগণ উল্লসিত হয়ে নেচে উঠেন।

অনেক সময় চলন্ত গরুর গাড়ির উপরেও আদব-কায়দা পরিবেশিত হয়। অনেকের গায়ে একসাথে দশ-বারোটি বিষধর সাপ জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। দেখা যায়, কারও শরীরে সর্পদংশন চলছে, রক্ত পড়ছে, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে! কিন্তু সর্পকুশলী সমানে গান গাইছেন, নাচ করছেন! —সে এক লোমহর্ষক দৃশ্য! না দেখলে বোঝাই মুশকিল। এই লোক উৎসবটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী এবং পৃথিবীর অন্য কোথাও এই ধরনের লোক উৎসব সম্ভবত দেখা যায় না; দূর দূরান্ত থেকে উৎসবটিতে অনেকেই আসেন। তবে বলা দরকার মল্লরাজাদের আমলে উৎসবের যতটা আড়ম্বর ছিল তা বর্তমানে একেবারে ম্রিয়মান। কোন রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে এই উৎসবের ধারাটি বজায় রয়েছে।

পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য আজকের দিনে অনেকেরই জানা। বিভিন্ন স্থানে ছৌ-নৃত্য এক উৎসব-রূপে পালিত হয়ে আসছে। নৃত্য কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গীই নয় সে যেন সুস্পষ্ট রূপে কথা বলে। বিবিধ প্রকার মুখোস ধারণ করে কোন বিশেষ ঘটনাকে নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। এর মধ্যে ঝালদা ও জয়পুরের ছৌ-নৃত্যের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। নৃত্যের তালে তালে ঢোল, মাদল বাজতে থাকে এবং নৃত্যকুশলী তাঁর দেহের মাংস পেশী তালে তালে সঞ্চালিত করতে থাকেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে এই ছৌ-নৃত্য বর্তমানে পুরুলিয়া থেকে প্যারিস পর্যন্ত যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

এই এলাকার প্রতিটি মানুষের ধর্মই হচ্ছে তাঁদের সংস্কৃতিকে অনুশীলন ও সংরক্ষণ করার। এখানকার মানুষ বিশেষ করে আদিবাসীগণ দুবেলা পেট ভরে খেতে পান না; পরনে কাপড় জোটাতে পারেন না; ঘরে ভাল ছাউনি দিতে পারেন না; তবুও তারা লোক-উৎসবের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে চলেছেন আজীবন। যার ফলে সম্ভব হয়েছে বঙ্গ-সংস্কৃতির গৌরবময় মহাপ্রবাহের উপনদী —বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি।

হিতোপদেশের গল্পকার

শংকরনাথ সেন

হিতোপদেশের কাহিনীর রচয়িতা ও স্রষ্টা বলতে আমরা ঈশপকেই জানি। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রীসে ঈশপ (কিংবা এইশোপস্) এক সুবিদিত নাম ছিল। অথচ তাঁর সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্যের খুবই অভাব। অনেকের ধারণা, সে রকম কোন ব্যক্তি আদৌ ছিলেন না। ঈশপ সম্ভবতঃ হিতোপদেশের কাহিনীর স্রষ্টার নামমাত্র।

হিরাডোটসের 'ইতিহাসে'র মত সুপ্রাচীন এবং প্রামাণ্য নির্ভরযোগ্য ইতিহাস, ঈশপের প্রকৃত অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। হিরাডোটস (আনুমানিক ৪৮৪—৪২৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেছেন যে মিশরীয় ফারাও আমাসিসের রাজত্বকালে, অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে (আনুমানিক ৬২০ থেকে ৫৬০ খৃষ্টাব্দ

পূর্ব পর্যন্ত) ঈশপ জীবিত ছিলেন, এবং স্যামোস দ্বীপের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই কারণে অনেকে মনে করেন, তিনি হিফিস্টোপলিসের পুত্র ইয়াদমোন নামক জনৈক বিত্তবান স্যামোসবাসীর ক্রীতদাস ছিলেন। ঈশপ আদৌ ক্রীতদাস ছিলেন কি না, সেটা এখনো সুস্পষ্ট নয়। তবে হিরাডোটসের তথ্যের প্রমাণগুলি বিচার করলে ধারণা হয় যে, ঈশপ ইয়াদমোনের দাস না হয়ে কোন গরীব আত্মীয় হতে পারেন। যাই হোক, তাঁর দাসত্ব প্রাচীনকালে সর্বজনস্বীকৃত; হয়তো প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই এই ধারণা গড়ে উঠেছে, সেইজন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয়নি। দাসত্ব থেকে ঈশপকে মুক্ত করে লিদিয়ার রাজা ক্রেসস তাঁকে দূত হিসেবে নিয়োগ করেন।

ঈশপ সম্বন্ধে হিরাডোটস বলেন যে ঈশপ এক সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য অনেকেরই জানা ছিল। দেলফির জনগণের হাতে ঈশপের মৃত্যু ঘটে। প্লুতার্ক 'দি সেরা ন্যুমিনিস ভিন্‌ডিক্টা'য় বলেছেন রাজা ক্রেসসের মনঃক্ষুণ্ণ করার ফলে দেলফিবাসীরা তাঁর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে এক জঘন্য দোষে লিপ্ত করে। অবশেষে পর্বত শিখর থেকে ফেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

এথিনিয়ান নাট্যকার, আরিস্তোফানিস (আনুমানিক ৪৪৫—৩৮৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) ৪২২ খৃষ্টাব্দ পূর্বে লিখিত 'বোলতা' নাটকের একাংশে ঈশপ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন :—

প্রোক্লিওন [ছটফট করছে এবং লাথি ছুঁড়ছে]: যখন—দেলফিবাসীরা—ঈশপকে দোষী সাব্যস্ত করে—

আন্তিক্লিওন : —এখন ঈশপের বিষয়ে ভাবতে হবে না।

প্রোক্লিওন : একটি পবিত্র পেয়েলা চুরির দায়, সে তাদের গল্প বলেছিল ঐ তেলেপোকা যে—

মোদ্দা কথা, দেলফিদের মন্দির থেকে একটা পেয়ালা চুরি করার দায় ঈশপকে তারা দোষী সাবস্ত্য করে। অবশ্য অরিস্তোফানিসের ওপর জনৈক ভাষ্যকার, ঈশপের পক্ষে কিঞ্চিৎ ওকালতি করেছেন। তাঁর মন্তব্য—মন্দিরের পেয়ালাটা দেলফিয়ানরা নিজেরাই ষড়যন্ত্র করে ঈশপের ঝোলায় রেখে দেয়। কিন্তু গল্পটির সঙ্গে বাইবেলের 'জেনেসিসে'র জোসেফ ও বেঞ্জামিনের গল্পটির সন্দেহ-জনক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে তাঁকে কেন্দ্র করে নানান কিংবদন্তীর প্রচলন হয়েছিল। জানা যায় যে তিনি অস্বাভাবিক রকম কুৎসিত, কদাকার, খর্বাকৃতির মানুষ ছিলেন। ঈশপ কিন্তু অসম্ভব রকম বাকপটু ও সুরসিক ছিলেন। তাঁর অপ্রীতিকর চেহারা ও উজ্জ্বল প্রজ্ঞার মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষণীয়। সবাইকে তিনি হাসাতে পারতেন কেবল তাঁর বুদ্ধিমান গল্প বলে নয়, তাঁর হাস্যকর আদব-কায়দা এবং তোতলামি তাঁকে অনেকখানি সহায়তা করত। পরবর্তীকালের লেখকদের বক্তব্য সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করাটাই বাঞ্ছনীয়, কারণ আমরা সাধারণত প্রামাণিক সূত্র বিশেষ কিছু পাই না। এক দলের অভিমত, ঈশপ জন্মসূত্রে একজন ফ্রিজিয়ান ছিলেন; আরেক গোষ্ঠীর বিশ্বাস, তিনি নির্ভেজাল থ্রাসিয়ান

ছিলেন। এই দুই গোষ্ঠীর বিবাদের নিষ্পত্তি কোনো দিনই সম্ভবপর নয়। অবশ্য একটা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়…তাঁরা সকলেই তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেন।

তবে ঈশপ যে ইয়াদমোনের ক্রীতদাস ছিলেন, তার বহু প্রমাণ আছে। দেলফির বাসিন্দারা যখন এক দৈববাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ঈশপের হত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে, তখন ইয়াদমোন, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইয়াদমোনের পৌত্র, সেটি গ্রহণ করেন।

আরিস্তোফানিস, জেনোফোন (জন্ম ৪৩০ খৃষ্টাব্দ পূর্ব নাগাদ), প্লেটো (আয়ুষ্কাল আনুমানিক ৪২৭—৩৪৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দ), গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটেল (৩৮৪—৩২২ খৃষ্টাব্দ পূর্ব) এবং অন্যান্য সুপ্রাচীন লেখকদের বিভিন্ন উল্লেখের মাধ্যমে জানা যায় যে পঞ্চম শতাব্দী থেকে ঈশপীয় কাহিনী এবং ঈশপের গল্প বলার রীতি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, বিশেষতঃ এথেন্‌সে। কোন কোন কাহিনী ঈশপের নিজস্ব ঢঙে রচিত, আদৌ তাঁর দ্বারা লিখিত কিনা, অথবা তাঁর সমকালীন অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত কিনা, আমরা সঠিক জানতে পারি না। যদিও আমরা ধরে নিই কতকগুলি গল্প লিখিত, সেগুলির কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী রূপান্তর ঘটেছে।

ঈশপের উত্তরকালে, নবসৃষ্ট প্রায় সব হিতোপদেশ কাহিনীর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে পড়েছে। বহু পুরনো এবং নতুন কাহিনীর আঙ্গিকগত রূপান্তর ঘটেছে, দীর্ঘায়িত নতুবা সংক্ষিপ্ত হয়েছে, গল্পের খুঁটিনাটিতেও ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটেছে। স্পষ্ট বোঝা যায় এই ধরনের যে কোন গল্পের স্রষ্টা হিসেবে অবলীলাক্রমে ঈশপকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিৎ যে অনেকের ধারণা প্রকৃতপক্ষে ঈশপ নামক ব্যক্তি কিছুই লেখেননি।

১৮৪০ সালে এবেল ভিলেমেন, ফরাসী জনশিক্ষা বিভাগের প্রধান, কতকগুলি গ্রীক পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান চালাবার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত হন। গ্রীক স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্বের আদর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় যখন গ্রীকরা তুর্কীদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

সেইজন্য তিনি এই কাজে নিযুক্ত করেন জনৈক প্যারিসবাসী, ম্যাসিডোনিয়ান গ্রীক, মিনোয়াডেস মাইনাসকে। গ্রেট লাভ্রা অঞ্চলের আথোস পর্বতে এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্তূপীকৃত আবর্জনার মধ্যে একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পান। পাণ্ডুলিপিতে গ্রীক কবিতায় ১২৩টি হিতোপদেশের কাহিনী সংবলিত ছিল। এগুলির লেখক জনৈক ইতালিয়ান, ভ্যালিরিয়াস ব্যাব্রিয়াস, রোমান সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডার সেভেরিয়াসের (রাজত্বকাল ২২০—২৩৫) সমসাময়িক। পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য লেখকের নামটি সংক্ষিপ্তাকারে অঙ্কিত ছিল—ভ্যালিব্রিয়াস। গল্পগুলিতে কৃত্রিমতার ছাপ সুস্পষ্ট, এবং রচনা শৈলীতে ভাবালুতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবু তৎকালীন পাঠকদের মন জয় করেছিলেন তাঁর রচনার দ্বারা।

সম্রাট তাইবেরিয়াসের রাজত্বকালে ফিড্রাস রচিত কবিতা সে তুলনায় যথেষ্ট চটকদার ও জীবন্ত। সর্বপ্রাচীন যে সংকলনটির হদিস আজও পাওয়া যায়, সেটি ফিড্রাসের লিখিত। তিনি একজন ম্যাসিডোনিয়ান (মতান্তরে থ্রাসিয়ান) ক্রীতদাস ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় রোমে

অতিবাহিত করেন। সম্রাট অগাস্তাসের রাজত্বকালে মুক্তিলাভ করেন। যদিও ব্যাব্রিয়াস ও ফিড্রাসের সংগ্রহ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তাঁরাই কেবল ঈশপের কাহিনী সংকলন করেননি। নথিপত্রে সর্বপ্রাচীন যে সংকলনটির কেবলমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটি খৃষ্টের তিনশ বছর পূর্বে এথেন্সে দেমেত্রিয়াস নামক ফ্যালিরামের এ্যাটিক দিমির জনৈক বাসিন্দার দ্বারা সমন্বিত।

ব্যাব্রিয়াসের পরে এভিয়ানাস নামক জনৈক রোমান, খৃষ্টাব্দ নাগাদ, লাতিন ভাষায় কবিতার মাধ্যমে বিয়াল্লিশটি হিতোপদেশের কাহিনী লিখেছিলেন, যদিও তিনি শুধুমাত্র ব্যাব্রিয়াসের রচনাগুলির কাব্যানুবাদ করেছেন। কেবলমাত্র বর্ণনার দ্বারা মূল কাহিনীগুলিকে দীর্ঘায়িত করেছেন। লেখাটি যদিও খুব উঁচু মানের নয়, তবু সমসাময়িকদের কাছে সেটি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল বলে, সংকলনটি দীর্ঘকাল অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

পঞ্চম শতক থেকে ফিড্রাস ও এভিয়ানাসের কবিতাগুলির গদ্য ব্যাখ্যা শুরু হয়। প্রধানতঃ তার মাধ্যমেই হিতোপদেশ কাহিনী সম্পর্কে অনেকে সচেতন হয়। দশ শতকের গোড়ার দিকে ফরাসী ভাষায় একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। পরবর্তী যুগে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসী কবি জাঁ দ্য লা ফঁতিয়েনের (১৬২১—৯৫) হাতে সার্থক রূপ পেয়েছিল। তিনি নানা সময়ে বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করেন—১৬৬৮, ১৬৭৮—৯ এবং ১৬৯৪ সালে।

জনৈক বাইজেন্টাইন পণ্ডিত, ম্যাক্সিমাস প্ল্যানুদেস (১২৬০—১৩৩০), ঈশপীয় হিতোপদেশের কাহিনী একত্রিত করে ঈশপের জীবনী লেখায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত জীবনীটি অবাস্তব, এবং তার সততা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। বহুকাল ধরে প্ল্যানুদেসের রূপান্তরটি একমাত্র নির্ভরযোগ্য সংস্করণ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। উক্ত সংস্করণের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হয়। প্রখ্যাত ইংরেজ মুদ্রক উইলিয়াম ক্যাক্সটন (? ১৪২১—৯১) একটি ইংরেজী সংস্করণ—Fables of Esope ১৪৮৪ সালে প্রকাশ করেন।

পরিশেষে বলে রাখা ভালো, আমাদের দেশে বহু বিদগ্ধজনই মনে করেন যে ঈশপের গল্প পৃথিবীর সর্বত্র ছাত্রমহলে এত প্রচলিত, সেই গল্পগুলি বিষ্ণুশর্মার রূপান্তর বা ভাবান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। রোমের 'সেন্টিয়ানো'র গল্প ও রাশিয়াতে 'ক্রিলফে'র গল্পগুলি যে বিষ্ণুশর্মার কাহিনীর চর্বিত চর্বণ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

শোনা যায়, দ্বিতীয় / তৃতীয় শতাব্দীতে পাটলিপুত্র নগরের মহারাজ অমরশক্তির দুরন্ত ছেলেরা ছয় মাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করে সুপণ্ডিত হয়েছিল একমাত্র এই বিষ্ণুশর্মা নামক গৃহশিক্ষকের প্রচেষ্টায়। রাজার আদেশে গল্পচ্ছলে রাজকুমারদের শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি 'পঞ্চতন্ত্র' প্রণয়ন করেন। অধিকাংশ গল্প পশু-জগতের প্রসঙ্গ নিয়ে। তবে 'পঞ্চতন্ত্র' বিচ্ছিন্ন কোন সাহিত্যসৃষ্টি নয়। রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে অতি সামান্য সংস্কৃত গ্রন্থেও লোক-শিক্ষার পক্ষে নীতিলাভের যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে। এক-একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ যেন নীতির কল্পতরু। কিন্তু হিতোপদেশের গল্পে কৌতুক-যমুনার কলহাস্যের সঙ্গে নীতি-গঙ্গার পবিত্রতা মিশে আছে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যেমন দেখেছি

অমিয়কুমার মজুমদার

সৌম্যেন্দ্রনাথকে কবে প্রথম দেখেছি, কখন তাঁর সংস্পর্শে প্রথম এলাম, স্মৃতির যাদুঘরে অনেক সন্ধান করেও সন তারিখ বার করতে পারছি না। যতদূর মনে হয়, প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন আমি কলেজের ছাত্র, তখন ছাত্রসংসদের আহ্বানে স্কটিশ চার্চ কলেজে তিনি মার্কসীয় দর্শনের ওপর একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি মনে নেই। শুধু মনে পড়ে প্রথম দর্শনে মনে বিস্ময়ের দোলা লেগেছিল। ঈশ্বর এত রূপ, এত গুণ, এক জায়গায় ঢেলে দিয়েছেন? ঋজু, সুঠাম, দীর্ঘদেহ। অসাধারণ প্রোজ্জ্বল দুটি চোখ, তীক্ষ্ণ নাসা, ঢিলে-হাতা সাদা পাঞ্জাবীর উপর বিশেষ

একটা ভঙ্গীতে চাদরটি জড়ানো, দৃঢ় অথচ ছন্দোময় পদক্ষেপে ধীরে ধীরে মঞ্চের উপর গিয়ে বসলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। শুরু হল সঙ্গীতের চাইতেও চিত্তাকর্ষক ভাষণ। অবাক বিস্ময়ে সমস্ত সভা মুগ্ধ। একটি টুকরো কথা শুধু আজ মনে পড়ছেঃ বিপ্লব মাত্রেই ভাব-বিপ্লব। বিপ্লব মানে এ নয় যে লোকলোচনের অন্তরালে বসে কয়েকটি যুবক বোমা তৈরী করছে ইংরেজকে মারবে বলে, ইত্যাদি। সেদিন আমাদের কয়েকজন সহপাঠী আগেই সিনেমার টিকিট (আমাদের যুগে বায়োস্কোপ বলা হোত) কেটে রেখেছিলেন, সৌম্যেন্দ্রনাথের বক্তৃতার খানিকটা অংশ শুনেই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে সিনেমায় যাবেন। ছবিটি ছিল 'এ টেল্ অব্ টু সিটিজ'। বোধহয় রোণালড্ কোলম্যান্ সিড্নি কার্টনের ভূমিকায়। এইটুকু বেশ মনে আছে বন্ধুদের সেদিন সিনেমা দেখা হয়নি।

দীর্ঘদিনের ব্যবধান। ১৯৫৯-৬০ সালে হুগলী মহসীন কলেজে অধ্যক্ষের কাজ করি। কি উপলক্ষে মনে নেই, দু-চার দিন ছুটির পরে হাওড়া স্টেশনে টিকিট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটছি, চুঁচুড়া যাবার জন্য। দেখি সেই ভিড়ের মধ্যে সারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ। তিনিও চুঁচুড়া যাবার জন্য টিকিট কিনছেন। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম, বললাম আপনার টিকিটও কাটি? স্মিতমুখে বললেন, না, আমিই কাটছি। এক সঙ্গে একই কামরায় পাশাপাশি বসে দুজনে যাচ্ছি। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠল, বেদনা-ভরা কণ্ঠে বললেন, শিক্ষিত মানুষ যাঁদের বলছেন, তাঁদের আচার-আচরণে সংস্কৃতির ছাপ কোথায়? রুচির অভিজ্ঞান কি দেখতে পাচ্ছেন? ওর কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে পড়লাম। বললাম, আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু বলুন না একদিন। রাজী হলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। দুই-একদিনের মধ্যেই আমাদের সৌভাগ্য হল আবার তাঁর ভাষণ শুনবার। তখন টেপ্-রেকর্ডার-এর প্রচলন ছিল না। বারবার আক্ষেপ হয়েছে, এই অনবদ্য, অননুকরণীয় ভাষণ ধরে রাখবার কি কোন ব্যবস্থাই আমরা করতে পারব না?

সৌম্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল আরও কয়েক বছর পরে। বন্ধুবর অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শান্তিকুমার দাশগুপ্ত (পরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী হন)—উভয়ের আহ্বানে টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্‌টিট্যুট দেখতে গিয়েছিলাম। আর একজনেরও বিশেষ আগ্রহ ছিল, তিনি ঐ ইন্‌স্‌টিট্যুটের সচিব অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বসু। একদিন আহ্বান এলঃ রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ্ এই বিষয়ে কিছু বলতে হবে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে একদিন সন্ধ্যায় কিছু বললাম। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়। সভা শুরু হতেই একেবারে শেষ সারিতে ধীরে ধীরে এসে বসলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। ওঁকে দেখেই বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে উঠল, ভাবলাম আমন্ত্রণ গ্রহণ না করলেই বোধহয় ভাল ছিল। আমি ত মা'র কাছে মামাবাড়ীর কথা বলতে এসেছি! এ কী ধৃষ্টতা! যাই হোক কোন রকমে আমার বক্তব্য শেষ করে ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনি আসবেন আমি ভাবতেই পারিনি।' বললেন, 'হুঁ, বাংলাদেশে কোথায় কে কি ভাবছে, বলছে এ সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু ধারণা আছে। আসুন, চা খেয়ে যাবেন।' এলগিন রোডে ওঁর বাড়ীর সামনের দিকের ঘরেই টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্‌টিট্যুট। উনিই প্রতিষ্ঠাতা। ভেতরে মখমলের মত নরম

সবুজ ঘাসের চত্বর ; তাই পেরিয়ে বসবার ঘরে গেলাম। আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে অসামান্য সুরুচির নিদর্শন। সহধর্মিণী শ্রীমতী দেবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আবার বিস্ময়। যোগ্য স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। মনে পড়ল কালিদাসের কথা—সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরৌ। চা খেতে খেতে গল্প। অনেক কৌতুক কাহিনী, অনেক নির্মম সমালোচনা শুনলাম। কথা যখন বলেন তখন ওঁর ওষ্ঠাধর ও জিহ্বা শুধু কাজ করে না। সমগ্র সত্তা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সমাজের, সকল স্তরের দুর্নীতির সমালোচনা করতে করতে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ; উত্তেজনা প্রশমিত হয় ব্যঙ্গ কৌতুকের মধ্য দিয়ে। 'অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে কখনই আপস করব না'—এই তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার। ওঁকে যতবার দেখেছি ততবারই মনে হয়েছে বিদ্রোহী নজরুলের সেই বহু-পঠিত কবিতার অংশ—'বল বীর, চির উন্নত মম শির'। অনেক কথার মাঝখানে সেদিন একটা মজার কথা বললেন। দিল্লীতে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার আমন্ত্রণে রামমোহনের ওপর ভাষণ দিতে গিয়েছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। সভাপতি ছিলেন একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি আমার পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বললেন : "Mr. Tagore is an expert in this field. He will do all the talking. I have nothing to say on this subject because I am neither a Bengali nor a Brahmo." সৌম্যেন্দ্রনাথ বললেন, "একথা শুনে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। আমি প্রথমেই সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম : 'What the President has just said is strange indeed. I am neither an Englishman nor a Christian. But how is it that I can appreciate Shakespeare's works ?' একথা শুনেই সভা উল্লাসে ফেটে পড়ল আর সভাপতি বোধহয় পালিয়ে যাবার পথ খুঁজতে লাগলেন।"

আর একদিন। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন সৌম্যেন্দ্রনাথ ছাত্র সে সময়কার কাহিনী বললেন। ১৯১৭ সালে সৌম্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। কলেজের পাঠ্যপুস্তকের ওপর আগ্রহ খুব বেশি ছিল না। উজাড় করে পড়তেন বিশ্বসাহিত্যের সেরা বইগুলি। বিশেষ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন শেরিডন, অসকার ওয়াইল্‌ড্‌, রসেটি, ইয়েটস্‌, এ. ই.। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ তাঁর নিত্যসহচর। বিদেশী কবিদের মধ্যে খুব বেশী ভাল লাগত কীটস্‌, শেলী ও ব্রাউনিং। ১৯১৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে যখন বি.এ. ক্লাসে উঠলেন তখন কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসে খুব তৃপ্তি পেয়েছেন। যদিও ওঁর ইকনমিক্সে অনার্স ছিল তবুও অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের শেক্সপীয়র পড়ানো, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজী কবিতা পড়ানো; মনোমোহন ঘোষের অধ্যাপনা বিশেষ করে তাঁর শেলী পড়ানো সৌম্যেন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ছোটবেলা থেকেই বাঁশী বাজাবার প্রবল ঝোঁক ছিল সৌম্যেন্দ্রনাথের। প্রেসিডেন্সি কলেজের পশ্চিমে যে খোলা মাঠ (এখন সে জায়গায় শতবার্ষিক ভবন উঠেছে) সেখানে দুপুর বেলায় গাছের তলায় বসে বাঁশী বাজাতেন (বলা বাহুল্য, ক্লাস পালিয়ে) আপন মনে। ক্লাসে শেষ বেঞ্চিতে বসে গুণ গুণ করে গান গাইতেন। বেঞ্চির উপর তবলা বাজানো চলত। এমনি একটি একক গানের আসরে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাসের পড়ানো থামিয়ে চুপি চুপি ওঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত হয়েছেন। কিন্তু শ্রীকুমারবাবু

তিরস্কার না করে বললেন, 'বেশ হচ্ছে, শুনি না একটু!' শ্রীকুমারবাবুর অধ্যাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে সৌম্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'শ্রীকুমারবাবুর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য, মনটা খুব analytical। দক্ষ ডুবুরির মত সমুদ্রের গভীরে গিয়ে মণিমুক্তা আহরণ করে আনতেন ঠিকই। কিন্তু সবশেষে বোধ হত উনি রসের অন্দর মহলটি কুলুপ দিয়ে এঁটে দিয়েছিলেন।'

বিদেশী শাসনের উপর সৌম্যেন্দ্রনাথের তীব্র ঘৃণা ছিল বাল্যকাল থেকেই। স্বদেশকে তিনি মণ প্রাণ দিয়ে নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন। তবুও রাজনৈতিক জীবনের আবর্তের মধ্যে ঢুকে পড়বেন এমন সংকল্প ছাত্রজীবনে ছিল না। তাঁর দেশের প্রতি ভালবাসা বিশেষ কোন কর্মের মধ্য দিয়ে তখনও মূর্তি পরিগ্রহ করেনি। এক কথায়, তখন পর্য্যন্ত তার জীবনটা ছিল 'ভাব-রসের আলোতে ফুটে-ওঠা মাটির সম্বন্ধ-হারা একটি অর্কিড্'।

জীবনের মোড় ঘুরে গেল ১৯২০ সালে। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব আনলেন গান্ধীজি। সেই অধিবেশনের প্রত্যেকটি বক্তৃতা সৌম্যেন্দ্রনাথ মন দিয়ে শোনেন। যে কথা নিরাভরণ তার যে এত শক্তি থাকতে পারে তা গান্ধীজির ভাষণ শোনার আগে সৌম্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। সৌম্যেন্দ্রনাথ বলতেন গান্ধীজির সেই বক্তৃতার কথাগুলি আগুনের হল্কার মত বুকে এসে বিঁধতে লাগল। বক্তৃতা শুনে মন তাঁর আর একবার অস্থির হয়েছিল আট বছর পরে মস্কোতে ট্রট্স্কির বক্তৃতা শুনে। ভাবজগৎ থেকে কর্মময় জগতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। ১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দুই ছাত্র ডেলিগেট, সৌম্যেন্দ্রনাথ ও ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল।

প্রথম যৌবনে গান্ধীজির প্রতি সৌম্যেন্দ্রনাথের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, উত্তরকালে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝেছিলেন গান্ধীবাদ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা চলে না। তিনি বলতেন, 'চরকার সূতো দিয়ে ব্রিটিশ সিংহীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সাগর পার করে দেওয়া সম্ভব হবে এই কল্পনায় মন আর সায় দিচ্ছিল না।'

প্রেসিডেন্সি কলেজে ইকনমিক্স অনার্স পড়েছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ নামজাদা সব অধ্যাপকদের কাছে। এঁদের মধ্যে স্যার জাহাঙ্গীর কয়াজী ছিলেন অন্যতম। অর্থনীতির যে সব বই তাঁরা পড়াতেন সে সব বইতে ধনতান্ত্রিক কাঠামোটিকে দুর্লঙ্ঘ্য চিরন্তন সত্য বলে মেনে নিয়ে সমাজ—ব্যবস্থার নানা নীতি বিশ্লেষণ করা হত। এ সব বই পড়ে সৌম্যেন্দ্রনাথের মন ভরত না। পৃথিবীব্যাপী অত্যাচার, অনাচার, শোষণ কখনও মানব সমাজের চিরন্তন নিয়ম হতে পারে না। এই কথাই বার বার তাঁর মনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তাই খুঁজে বেড়াতে লাগলেন সোস্যালিজম সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ; পড়লেন 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', সন্ধান পেলেন নতুন জগতের। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মোহ-মুক্ত, যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে এগিয়েছেন সৌম্যেন্দ্রমাথ। 'বাঁধাবুলির বিভীষিকা' আর 'বাঁধা সড়কের ব্যভিচার' সৌম্যেন্দ্রনাথ কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারেননি।' ট্রট্স্কিনীতির

যেটুকু তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য তা যেমন তিনি গ্রহণ করেছেন। তেমনি কট্টর ট্রট্স্কি পন্থী বলতে যা বোঝায় তিনি কোনদিনই তা ছিলেন না। স্টালিনের ভয়ঙ্কর ক্ষমতা-লিপ্সা এবং ক্ষমতা দখলে রাখবার জন্য চাতুরী, চক্রান্ত সব কিছুই সৌমেন্দ্রনাথ ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তবু স্টালিনকে তাঁর প্রাপ্যটুকু সৌমেন্দ্রনাথ দিয়েছেন। তিনি বুঝছিলেন স্টালিনের চিন্তা, অনুভূতি ও আত্মপ্রকাশের মধ্যে ট্রট্স্কির মতন সূক্ষ্মতা না থাকতে পারে কিন্তু স্টালিন জনসাধারণের খুব কাছে আসতে পেরেছিলেন। সেরকম কাছাকাছি আসা ট্রট্স্কির পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কমিউনিজমের নানা চেহারাই সৌম্যেন্দ্রনাথ দেখেছেন। যেমন দেখেছেন বিপদসংকুল কমিউনিজম, তেমনি দেখেছেন কফি হাউসের বিলাস সামগ্রী হিসেবে কমিউনিজমকে। ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ব্যক্তিত্বের সম্ভ্রমকে সৌম্যেন্দ্রনাথ বড় স্থান দিয়েছেন চিরকালই। তিনি বলতেন, 'সমুদ্রের অসীম জলরাশির সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ-এর যেমন নিবিড় সম্বন্ধ, আমার মতে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ তেমনি গভীর, তেমনি অবিচ্ছিন্ন। ঢেউ-এর সঙ্গে জলরাশির সম্বন্ধ স্বীকার করার মানে যেমন ঢেউকে লঘু করা নয়। তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সত্য সম্বন্ধ স্বীকার করার মানে ব্যক্তিত্বকে লঘু বা খর্ব করা নয়।' সোভিয়েট রাশিয়ায় সাহিত্যের দুটি ভাগ, মজুর সাহিত্য ও বুর্জোয়া সাহিত্য, সৌম্যেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। মজুর সাহিত্য কি? মজুরের সৃষ্ট সাহিত্য না মজুর-জীবন-বিষয়ক সাহিত্য? দ্বিতীয়টি বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। প্রথমটি সাহিত্যপদবাচ্য হতে হলে তাকে রসোত্তীর্ণ হতে হবে আর লাঞ্ছনা ও শোষণের ছবির সঙ্গে নতুন জীবন সৃষ্টির ইঙ্গিত রাখতে হবে। তাকে মজুর সাহিত্য না বলে বিপ্লবী সাহিত্য বলাই বেশী সঙ্গত।

'প্রাভদা'-তে প্রকাশিত গর্কির একটা লেখার কথা সৌম্যেন্দ্রনাথ প্রায়ই উল্লেখ করতেন। একজন তরুণ সাহিত্যিক তাঁর কবিতায় একটি নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন তার আঙুলগুলি বিশেষ কোন একটি ফুলের মত কোমল আর তার মুখের রং ডালিম ফুলের মত। এই কবিতা পড়ে একদল কট্টর মার্কসবাদী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন, 'লেখক নিশ্চয়ই কোন বুর্জোয়া মেয়ের প্রেমে পড়েছে। নইলে মজুর মেয়ের হাতের আঙুল কি কখনও কোমল হতে পারে?' লেখক অবশ্য প্রাণে বাঁচলেন, গর্কির মধ্যস্থতায় ও সমর্থনে। গর্কি লিখেছিলেন, মজুর মেয়ের কল চালানো কড়া হাতের আঙুল প্রেমিকের চোখে কোমল হয়েই দেখা দেয়, আর এ খবর যে রাখে না সেই অরসিকের কাছে কাব্যরস পরিবেশন করা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি?

সৌম্যেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁর খুব কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেলাম। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ-এর জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ডাকলেন আমাকে, রামমোহনের জন্মের দ্বিশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের কর্মসমিতির মধ্যেও নিলেন আমাকে। চার নম্বর এলগিন্ রোডের বাড়ীর সামনের দিকে কতদিন সন্ধ্যায় সভা বসেছে। সভার মাঝখানে উপবিষ্ট সৌম্যেন্দ্রনাথ। কার্যসূচী কিভাবে তৈরী হবে, কে কি গান গাইবেন, কোথায় কোন্ সভা হবে, সব বিষয়ে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সভ্যদের, সকলের কথা শোনবার পর। নিজের মতামত কখনও জোর করে চাপিয়ে দেননি। তবুও তাঁর সভা পরিচালনা করার এমন দক্ষতা ছিল যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওঁর মতে

আমাদের সায় দিতে হয়েছে, কিন্তু সানন্দে। রামমোহন সম্বন্ধে সৌম্যেন্দ্রনাথের মনোভাব কি ছিল তা শিক্ষিত মহলে সুবিদিত। রামমোহন-ভাবনার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ছিল সৌম্যেন্দ্রনাথের জীবনের ব্রত। ভারতপথিক রামমোহনের সঙ্গে ভারতবাসী সম্মিলিত পদযাত্রায় এগিয়ে চলুন এই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে রামমোহন প্রসঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথের মতের মিল কোনদিনই হল না। আচার্য রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী , সৌম্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী। মনে পড়ছে এসিয়াটিক সোসাইটির কক্ষে রামমোহন সম্বন্ধে সৌম্যেন্দ্রনাথের বক্তৃতা। দেড়ঘণ্টা একটানা ইংরেজিতে বক্তৃতা করে গেলেন। পাশেই ছিলেন টেপ-রেকর্ডার নিয়ে তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতী ঠাকুর। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম সারিতে অনেকের মধ্যে রয়েছেন আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার। যেখানেই বিতর্কমূলক প্রসঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথ তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে নিজের মত পরিবেশন করছেন, সেখানেই তিনি একটু বিরতি দিয়ে আচার্য রমেশচন্দ্রের দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। আচার্য রমেশচন্দ্র ও সৌম্যেন্দ্রনাথের মধ্যে রামমোহন প্রসঙ্গে যত মতবিরোধ থাকুক না কেন, দুটি মৌল বিষয়ে উভয়েই একমত ঃ রামমোহন অন্ধ সংস্কারের উপর যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছেন আর ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষায় আধুনিকীকরণের পথ প্রশস্ত করেছেন।

পরিশেষে যে কথাগুলি সৌম্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার বারবার মনে হচ্ছে তা হল এই, এমন মার্জিতরুচি, পুরুষ অনুশীলিত মনের অধিকারী ও আপোষহীন সত্যাগ্রহী বর্তমান বাঙালী সমাজে খুব বেশি নেই। রোমান্টিকতা ও বিপ্লবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই একথা তিনিই বলতে পারেন যিনি জীবনকে খণ্ডখণ্ড করে না দেখে সামগ্রিক রূপে দেখেছেন। জীবনকে অখণ্ডরূপে গ্রহণ করা, জগৎ ও জীবনের সমন্বিত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করা (to see life steadily and see it whole) এই ছিল সৌম্যেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক অভীপ্সা। বাস্তবের মধ্যে একটি অপূর্ণতাবোধ তাকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের দিকে। তাই "যাত্রী" বইটিতে নিজের জবানবন্দী পেশ করেছেন ঃ

"আমি জাতে রোমান্টিক। ···রোম্যান্‌টিসিজ্‌ম্‌ বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া ভীরুতা নয়।··· বাস্তব জীবনের দৈন্য, অপূর্ণতা যে মন গভীরভাবে অনুভব করে না সে মন রোমান্টিক হতেই পারে না। এই অপূর্ণতা-বোধ মনের মধ্যে অসহ্য দহনজ্বালা সৃষ্টি করে। তবেই মনের বিদ্রোহের কালবৈশাখী ঘনিয়ে আসে, বিদ্রোহী মন পূর্ণতার সন্ধানে বের হয়, কল্পনার সমস্ত শক্তি দিয়ে পূর্ণতার রূপসৃষ্টির কাজে লেগে পড়ে।···পূর্ণতার কল্পনা ও পূর্ণতার রূপসৃষ্টি যে মানুষ করে সে নোংরা বাস্তবকে প্রচণ্ড আঘাত করে। সে জুগিয়ে দেয় কোটি কোটি লোকের হাতে এই বাস্তবকে ভেঙে-চুরে নতুন বাস্তব সৃষ্টি করবার হাতিয়ার।···মানুষের ইতিহাস যখনই এসে থমকে দাঁড়িয়েছে যুগের চৌমাথায় তখন এই রোম্যান্টিকেরাই নিজেদের জ্বালিয়ে ধরেছে মশাল করে। নিজেদের পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে মানুষকে পথ দেখাতে।···এই হোল রোম্যান্টিকের ডাক। এই ডাকে আমার প্রাণ সাড়া দিয়েছে। এই ডাকেই আমার প্রাণ তার পূর্ণ রস পেয়েছে। এই জন্যেই আমি রোম্যান্টিক, আর রোম্যান্টিক বলেই আমি বিপ্লবী।"

একটি কল্পনা ও একজন কবি

গোপা দত্ত

আমরা সবাই বোধহয় গোপনে গোপনে নিজের মত করে একটি সবপেয়েছির দেশের, একটি হঠাৎ করে পেয়ে যাওয়া আলাদিনের পিদিমের স্বপ্ন দেখে থাকি। কিন্তু আমাদের সেই চাওয়াটির ওপর দৈনন্দিন জীবন নিয়ত একটি স্থূল বিস্মৃতির আবরণ পরিয়ে দেয়। যাঁদের কল্পনাগুলি এত অল্পায়ু নয় তাঁরাই বোধহয় কবি, তাঁদের অতৃপ্তি আর আকাঙ্ক্ষা, দুই–ই অনেক বেশী তীব্র। সব কবিই বোধহয়, হৃদয়ে লুকিয়ে রাখেন নিজস্ব একটি কল্পলোকের ছবি, যা তাঁর স্মৃতির সবটুকু সৌন্দর্য ছেঁকে গড়া, তাঁর সমস্ত অতৃপ্ত বাসনার ফলন্ত ঐশ্বর্যে মায়াময়।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনার ছবিটিকে তেমনি করেই তুলে ধরছে তাঁর কবিতাবলী। অবশ্য কোনো অস্থির উত্তেজনা তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। আবেগের শীর্ষবিন্দুতে উত্তরণের মুহূর্তে ও বাস্তবের জমিতে পা অবিচল থাকে, এতটাই স্থিতধী তিনি, শেষ পর্যন্ত সেই আপোস নীতির নিরুপায় অনুগামী, ভারতীয় মধ্যম মার্গের পথিক।

এবং মাঝে মাঝে দার্শনিক সুলভ নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বলে থাকেন—"কি পাইনি, তার হিসাব মিলাতে / মন মোর নহে রাজী।" কিন্তু সে সব নিষ্ফল বাসনার যে মাঝে মাঝে অনিবার্য বিষণ্ণতা ঘনিয়ে আসত তার সাক্ষী অনেক আছে। সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি কটি তো মনে পড়বেই ঃ—

"বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে ;
ধন নয়, মান নয় একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।"

(আশা / পূরবী)

সেখানে নদীতীরে এক ঘরে ফেরা গোধূলির বর্ণ বিরল ছবি এঁকেছেন গাছের স্নিগ্ধ ছায়া আর চামেলি সুবাস মিলিয়ে। এই নিভূ্র্ষণ শান্তির জন্য যিনি ব্যাকুল হয়েছেন আমরা অনুভব করি সেই কবি প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে বসে স্বভাবতই ছায়াচ্ছন্ন।

ছবিটি কিন্তু চিরকাল এমন ছি লনা। কবি মানস বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বাসার ছবিটিও আশ্চর্য ভাবে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। তবে সব সময়ই এই কল্প গৃহের সঙ্গে একজন 'কল্পনালতা' নারী এসেছে অনিবার্য ভাবে, আর এসেছে তার প্রিয় প্রতীক নদী। যা কখনো জীবনের অবিরল গীত, কখনো শান্ত এক গার্হস্থ্য নিবিড়তাকে আমাদের মানসে ধরিয়ে দেয়।

যৌবনে যে ছবিটি দেখতেন তাতে কারুকার্য কম নেই, বরং একটু অতিরিক্ত—

"রঞ্জিত [illegible]র মাঝে তুষারধবল
তোমার সাদসৌধ, অনিন্দ্য নির্মল
চন্দ্রকান্ত ময়।"

(আবেদন / চিত্রা)

রাণীর এই রম্য প্রাসাদের বল্লরীবিতানে মালাকরের জীবন বেছে নিয়েছেন কবি। স্ফটিক প্রাঙ্গণে জলযন্ত্রের উৎসধারার অবিরাম গান শুনবেন শুভ্রগ্রীবা সারসের প্রতিবেশী হয়ে। আর—

"অদূরে অলিন্দ'পরে—
পুঞ্জ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্বভরে
নাচিবে ভবনশিখী,"

আর সেই রাণী,—খাজুরাহো বা অজন্তার কোনো শিলীভূত নিখুঁত বিলাসিনী যেন মার্লিনের জাদুকাঠিতে জীবন্ত—

—"কনকমুকুর অঙ্কে, শুভ্রপদ্মকরে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসীকূলে
বসিবে যখন সপ্তপর্ণতরুমূলে
মালতী-দোলায়—পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন।"

যেন 'উত্তরমেঘের' একখানি ছেঁড়া পৃষ্ঠা। মর্মর প্রাসাদ, পুষ্পবিতান, কুমুদকহ্লারে সুগন্ধি সরোবর, ভবনশিখী, মরাল, এইসব অনুষঙ্গ সহ এই নারী আমাদের কালিদাসকেই মনে পড়িয়ে দেয়। উনিশ শতকের এলাকায় বসে কবি সেখানেই যেতে চাইছেন। তাঁর কল্পনা অতীত গন্ধ বাসিত তাঁর চিত্রকল্পগুলি সংস্কৃত কাব্যের মত পুষ্পভারাবনত বর্ণিল।

'জনসংঘাত মদিরা' পান করার ইচ্ছে কখনো সখনো হলেও আসলে সে জিনিস তাঁর একান্তই অপছন্দ। ক্লান্ত নৌকো বাঁধতে চান এক ঘুমের ঘোর মাখা দেশে। এ তাঁর অনেক স্বপ্নের, 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশ,' রেবা শিপ্রা বেতস্বিনীর বীরের কোনো উজ্জয়িনী বা দশার্ণ।—

"ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে;
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া-করা
ছেয়ে গেছে ঝরে-পড়া বকুলে।"

(**দিনশেষে / চিত্রা**)

শান্ত নদীটির মতই এসেছে লজ্জাবতী এক তরুণী। এই কালিদাসীয় কল্পনা শুধু যৌবনে নয়, সারা জীবনই তাঁকে অধিকার করেছিল। তাই তিনি পূর্ণতার সন্ধান করেন সেই নারীর মধ্যে যার চুলে 'ধূপবাস' অঙ্গে 'কুসুমগন্ধ'। যক্ষপ্রিয়া বা বাণভট্টের কাদম্বরীর আদলে গড়া এই 'পূর্বজন্মের প্রিয়া'কে ঘিরে যে কল্পপ্রাসাদ গড়ে উঠেছে বিশ শতকের ছোঁয়াচ থেকে তা একেবারেই মুক্ত ঃ—

"প্রিয়ার ভবন।
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে—
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে।"

(স্বপ্ন / কল্পনা)

কিন্তু কোনো একটি বিশেষ কল্পনার বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে অবিরত সংক্রমণ অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের স্বভাব নয়। তাই এক সময় দেখি ছবিটি বদলাতে শুরু করেছে। কবি আর তৃপ্ত হতে পারছেন না, শ্বেতপাথরের শয়ন মন্দিরে, ছায়াচ্ছন্ন মালঞ্চে, ধূপের সুবাসে, মেঘদূতীয় জীবনচর্যায়। শুরু হয়েছে আভরণ বিসর্জনের পালা। এই ভাবেই পৌঁছেছেন 'সব পেয়েছির দেশে'। শিশুর মত প্রাণ, চঞ্চলতায় কিছুটা—বা নির্মম উদাসীনতায় স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে, একে একে বাতিল করে দিয়েছেন পূর্বতন চিত্রকল্পগুলি ঃ

"রমণীরা মোতির সিঁথি পরে না কেউ কেশে,
দেউলে নেই সোনার চূড়া সব পেয়েছি'র দেশে।"

(সব-পেয়েছি'র দেশ / খেয়া)

"হরশিরশ্চন্দ্রিকা ধৌত" হর্ম্য থেকে নেমে এসেছেন মাটির ঘ্রাণ নিতে। আর যে মেয়েটিকে গুনগুনিয়ে গান গেয়ে চরকা কাটতে দেখলাম তার নাম 'মালবিকা' হতেই পারে না। কবি যে অন্যতর কিছু চাইছেন, 'সুয়োরাণীর সাধ' যেন তারই আভাস দেয়। রাজা সুয়োরাণীকে প্রাসাদ বানিয়ে দিতে চেয়েছেন—

"তার দেওয়াল হবে গজদন্তের, শঙ্খের গুঁড়োয়—মেঝেটি হবে দুধের মত সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।"

(সুয়োরাণীর সাধ / লিপিকা)

কিন্তু এই মর্মর শীতলতার মোহ তো আগেই পেছনে ফেলে এসেছেন কবি। দুয়োরাণীর কুঁড়েটির প্রতি সুয়োরাণীর ঈর্ষাতুর লুব্ধতায় যেন তাঁরই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ,—"পথের পাশে নদীর-ধারে ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়ে ঘর, চাঁপা গাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে।" আর সে ঘরের লক্ষ্মী প্রতিমাটি—"হাতে শাদা শাঁখা, পরনে লাল পেড়ে শাড়ী, স্নানের পর ঘড়ায় করে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার ওপর ঝিকিয়ে উঠছে।" এ যে কবিরই একটা নতুন পথে বাঁক নেওয়ার ইতিকথা, এ বিশ্বাস প্রাসাদের ধ্রুব হতে থাকে যখন দেখি আর কোনোদিন তিনি রাণীর চন্দ্রকান্তমণিময় আমাদের সোপানে পা রাখেননি। এখন তিনি যার কথা ভাবেন, সে এক কুটিরের আঙিনাতে অপেক্ষা করে আছে

"তার
পরনে ঢাকাই শাড়ী—
কপালে সিঁদুর।"

(কিনু গোয়ালার গলি / পুনশ্চ)

কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে ছুটি নিয়ে যেতে চান ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, সংগোপনে মনে লালন করেন, শালমহুয়ার ছায়ায় রাঙামাটির পথের ধারে, জারুল পলাশ মাদারের সাহচর্যে একটি সহজ বাসা বাঁধার স্বপ্ন। সন্তর্পণে রচনা করেন গৃহসজ্জার অনুষঙ্গ।

"ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা
খয়েরি রঙের ফুলকাটা
দেওয়াল বাসন্তী রঙের,
একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,"

(বাসা / পুনশ্চ)

একটি নারীও এসেছে,

"পাশের কুটিরে সে থাকে,
তার চালে উঠেছে ঝুমকোলতা।
আপন মনে সে গায়……"

আসলে এ'তো সেই যুগ যখন তিনি ফুল বাগানের ফুলগুলিকে তোড়ায় না বাঁধার প্রতিজ্ঞা নিচ্ছেন। তাই শেষ পর্যন্ত বৈদিক ঋষির মত সুদূর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করেন—

"আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।"

(৪৪ সংখ্যক কবিতা / শেষ সপ্তক)

কোনো রূপসজ্জা নয়, বাসনার অমেয় তৃপ্তি নয়, আরেক গভীরতর আকাঙ্ক্ষা।

—"সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,"

এ বাড়ী তিনি বানিয়ে ছিলেন তা জানা। কিন্তু যা চেয়েছিলেন তেমনটি কি? নিশ্চয়ই নয়। অন্তরঙ্গদের লেখায় ছড়িয়ে আছে কবির খেয়ালের স্বীকৃতি ঃ

"গুরুদেব নতুন নতুন বাড়ীতে বাস করতে ভালোবাসেন। এ ছিল তাঁর একটা শখ, খুব বেশীদিন এক বাড়ীতে থাকতে পারতেন না।"

('গুরুদেব' / রাণী চন্দ)

আমাদের কি মনে হয়না এই কল্পকুঞ্জের সন্ধানেই তিনি করেছেন নিরন্তর চঞ্চলতা? শান্তিনিকেতনের কবির আবাসগুলির কথা মনে পড়ে যায়ঃ উদয়ন, কোনার্ক, উদীচী, পুনশ্চ, শ্যামলী। যদিও তিনি জানতেন ধ্রুব ভাবে, "এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা / হবেও না।"

কিন্তু আজীবনের উষ্ণ একটি বাসনা এবং চিত্র থেকে চিত্রান্তরে অনুসন্ধান অনেক বেশী সত্য হয়ে আছে, চিনিয়ে দিচ্ছে একটি অতৃপ্ত বিশুদ্ধ কবি আত্মাকে।

হিন্দু নবজাগরণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী

কমলকুমার ঘটক

উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হতে থাকে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতি লাভ করে তখন এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অল্পকালের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) সম্পূর্ণ নতুন এক হিন্দুধর্মের বাণী দেশে এবং বিদেশে প্রচার করতে থাকেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসের সাক্ষাৎ লাভ করেন আচার্য কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে এর ফলে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এরপর সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মন দেন (১৮৮৪-৮৫)।

এইসব ঘটনায় একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ ম্রিয়মান হয়ে পড়ে তেমনি হিন্দুদের মনে নতুন বল সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ভাবধারার বাহক বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৮০-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিম সাহিত্যে এই নব্য হিন্দুধর্ম (Neo-Hinduism) আলোচিত হতে থাকে। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) প্রকাশের পর শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি বঙ্কিমের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—উপন্যাসগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাতি লাভ করে। এই গ্রন্থগুলি প্রধানত সাহিত্যকীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর বঙ্কিম সচেতনভাবে হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম'—এ যুগের রচনা। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বঙ্কিমের 'প্রচার' এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলিতে ধর্মই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। বঙ্কিমের ধর্মমত সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে 'ধর্মতত্ত্ব' 'কৃষ্ণচরিত্র'ও গীতা ব্যাখ্যায়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজার রাজবাটীর এক শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করে পাদ্রী হেষ্টি হিন্দুধর্মের উপর তীব্র আক্রমণ করেন। 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রত্যুত্তর দেন। এইসময় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনে কতকগুলি প্রশ্ন দেখা দেয়। Positivist Jogesh Chandra Ghoshকে লিখিত তাঁর *Letters on Hinduism* এরই ফল। 'আনন্দমঠ'-এর কিছু পূর্বে এবং 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'-এর পরে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, তাঁর শেষের

উপন্যাসগুলি [‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’, ‘সীতারাম’] অনুশীলন তত্ত্ব প্রচারের ‘কল’ মাত্র। এই তিনটি উপন্যাস ‘ত্রয়ী’ নামে বাঙালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত আলোচনা স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। কিন্তু বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল তা তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। “সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কারণ সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য তাহা ধর্ম।……সাহিত্যকে ত্যাগ করিও না। কিন্তু সাহিত্যকে নিম্নসোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।” [প্রচার ১২৯২ পৌষ ঃ ধর্ম ও সাহিত্য] ধর্ম কি, তা ‘দেবী চৌধুরাণী’র উপন্যাসের আদর্শে বঙ্কিম লিখেছেন, “The substance of religion is culture, the fruit of it the higher life.” বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মকে একটা সম্পূর্ণ ধর্ম বলে মনে করতেন। হিন্দুধর্ম ছাড়া ভারতের কোনো ভবিষ্যৎ নাই, এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হবে। কিন্তু উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতীয়তাবাদ। কাজেই বঙ্কিমের মতে স্ববিরোধ আছে মনে করা উচিত হবে না।

“তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম।” প্রচলিত হিন্দুধর্মের পরিবর্তন দরকার, বঙ্কিম একথা স্বীকার করতেন। বহির্বিষয়ক জ্ঞানের চর্চা ইংরাজ শাসনের ফলে হবে, তারপর অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান লাভ সহজ হবে। ‘আনন্দমঠে’ তাই হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সার্থক হয়নি। ইংরাজ শাসনের ফলে Enlightenment এলেই প্রকৃত সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। “যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয় ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।” এইসঙ্গে ভবানন্দের উক্তিও স্মরণ করা যায়। “আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর দেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?” বৃটিশ রাজত্ব অবশ্যই মুসলমান শাসনের চেয়ে শুভ—জাতীয়তাবাদী বঙ্কিম তাই বিশ্বাস করতেন।

‘দেবী চৌধুরাণী’ ও ‘সীতারামে’ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁর আদর্শ ছিল না। তিনি সাকার উপাসনা এবং সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। গীতার ধর্মই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পুরুষ। ‘দেবী চৌধুরাণী’তে বয়স্যা বলিল, “শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে, কেননা তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।” লেখকের মন্তব্য, “ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়াপিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।” ঈশ্বরে ভক্তির কথা বঙ্কিম ধর্মতত্ত্বে বলেছেন। কিন্তু সে ভক্তি মধ্যযুগীয় অহৈতুকী ভক্তি নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যায় জ্ঞান এবং কর্মের–ই প্রধান ভূমিকা। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার কথা বলেছেন। অনাসক্তি কি? “ইহার প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয় সংযম।……দ্বিতীয় লক্ষণ নিরহংকার।……তারপর তৃতীয় লক্ষণ এই, সর্বকর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে।” ঈশ্বরলাভের জন্য ভক্তির কথা সাধারণতঃ উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেননি। প্রফুল্ল বলছে, “চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই দেখা, অন্য

কোন প্রত্যক্ষ দেখা নয়। মানস প্রত্যক্ষও দেখা নয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়—রূপ বহির্বিষয়—মানস প্রত্যক্ষের বিষয় অন্তর্বিষয়। মনের দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন। ঈশ্বরকে দেখা যায় না।” শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতের সঙ্গে বঙ্কিমের পার্থক্য লক্ষণীয়। পরমহংস ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সাধক আর বঙ্কিম মুক্তিবাদী। পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতে বঙ্কিম প্রভাবিত হননি, বরং উপেক্ষিত হয়েছিলেন। গীতার মোক্ষযোগের মূলসূত্র—“তমেব স্মরণাং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত” (৬২ / ১৮) “সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” (৬৬/১৮)। ‘সীতারাম’ ও ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্গীতায় ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে, কর্ম এবং সন্ন্যাসের মধ্যে ভগবান যে সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শ হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হ’লে হিন্দুরাজ্য সার্থক হবে না। তাই সীতারামের স্বপ্ন তার ভোগলিপ্সায় ধ্বংস হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মবিস্মৃত হিন্দুকে একদিকে প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করেছেন অন্যদিকে তার চরিত্রের অবনতি ও “অপকৃষ্ট ধর্মের” উপর কশাঘাত করতেও ভোলেননি। জনপ্রিয়তার লোভে তিনি নিজের আদর্শপ্রচার থেকে শেষদিন পর্যন্ত বিমুখ হননি। ‘সীতারাম’-এ ললিতগিরির বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, “……তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।” হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকে বঙ্কিম এক পবিত্র কর্ম বলে মনে করতেন। সম্ভবতঃ সীতারামের সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে তিনি হিন্দুকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে সীতারামের প্রতি চন্দ্রচূড়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য, “আপনি মুসলমানের প্রতি সম্প্রীত হইলে মুসলমান হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে? হিন্দুধর্ম আর দাঁড়াইবে কোথায়? ইহা আপনার শুভাদৃষ্ট কেননা যে হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিবে, সেই মনুষ্যমধ্যে কৃতী ও সৌভাগ্যশালী।”

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীতারাম ব্যর্থ হলেন। কারণ “যে সীতারাম হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, যে সীতারাম রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রী-কে খুঁজিয়া বেড়াইল, যে সীতারাম আপনার প্রাণ দিয়া শরণাগত বলিয়া গঙ্গারামের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সেই সীতারাম রাজা হইয়া, রাজদণ্ড প্রণেতা হইয়া শ্রী-র লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিল। যে লোক-বৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইতেছে।”

‘সীতারাম’ উপন্যাসের শেষে আপাতব্যর্থতার মধ্যেও আশার আলো দেখা যায়। সীতারামের চিত্ত ‘আবার বিশুদ্ধ’ হয়েছে। এই ‘চিত্তশুদ্ধি’ বঙ্কিমের মতে হিন্দুধর্মের সার। “এই চিত্তশুদ্ধি মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল। ভক্তি ও প্রীতি কার্যকারিণী বৃত্তি। কিন্তু কেবল কার্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম লাভ হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় না এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধর্মানুমোদিত কার্যের উপযোগী ক্ষমতা জন্মে না এবং হৃদয়ও শান্তিলাভ করে না। অতএব চিত্তশুদ্ধি সকল বৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলন ও সামঞ্জস্যের-ই ফল।” [প্রচার ১২৯২ ফাল্গুন : চিত্তশুদ্ধি]

চলে যাব শৈশব শিকারে

গুঞ্জা সেনগুপ্ত

ফিরে যাব গন্ধহীন শৈশবের দিনে
এখন এ অন্ধকারে বড় তাড়াতাড়ি আসে জহ্লাদের হাত
নিঃসারে কুঁচিয়ে দেয় ফুল পাতা কোমল নির্যাস,
চোখের সামনের মুখ অকস্মাৎ চলে যায় অন্ধ উর্ধ্বলোকে
এখন কেই বা আছে অন্তরংগী,
"এস" ব'লে যে দাঁড়াবে সবুজ পর্দায় ঢাকা মণিপুরী ঘরে ॥

দেওয়ালেরও কান আছে,
বেদরদী তোমরা মানুষ, কেন দেওয়ালেরও চেয়ে রূঢ়ভাবে—
শুষে নাও বিশ্বাসের রস ?
চিরকাল, আমি চিরকাল পাড়ি দিতে চাই ঠাণ্ডা ঘরে,
আমি হাত রাখব না গনগনে উনুনের আঁচে
সুস্বাদু বিস্মৃতিভরা সুধাপাত্র হাতে নেব তুলে,
বেহারারা চলে আসে শূন্য পাল্‌কী নিয়ে
ওই ফেলে রেখে আসা দোদুল্য আবাসে
আমি ফিরে চলে যাব শৈশব শিকারে ॥

খাঁচাভর্তি মুনিয়া টিয়ারা দোল খায়
"কান্তা" বড় ভালোবাসে তোমাকে যে জন,
তুমি আরো ভালোবেসে পরিশুদ্ধা হ'লে
জালেবদ্ধ মুনিয়া ও টিয়া ছাড়া পাবে
আকাশের বুকে
তোমাদের দেখে আমি এই ঘাসে ডোবানো দু'পায়ে
মেখে নিয়ে আশ্বাসের মাটী,
অবশেষে ফিরে যাব শৈশব শিকারে ॥

ভেবেছিলাম—তুমি আসবে

চিত্রভানু রাহা

বিষণ্ণ চৈতালী উন্মাদনায়
যখন কাশফুলের মত রোগা ইচ্ছেগুলো দুলেছিল—
বাতাসে ছুটির মাতাল মহুয়া
আর কৃষ্ণকলির আভাস ছিল গাছে
ভেবেছিলাম—তুমি আসবে।

সোনালী রোদ্দুরের মুখে মুখ লুকিয়ে
যখন নির্বোধ বসন্ত বিদায় নেয়—
যখন নিঃশেষ বৈশাখের খর রোদ্দুরে
রূপোলী প্রজাপতি পুড়িয়ে নেয় ডানা
ছুটে পালায় দিগন্তে ;
অপ্রার্থিত জ্যোৎস্নার চোখে চোখ রেখে
যখন সময় তৃষ্ণায় মদির হয়—
জঠর জনম জীবিকার ভরা কোটালে
গা ডুবিয়ে ভেবেছি—তুমি কি আসবে ?

দিন গেল। মধ্যরাত্রি। দীর্ঘশ্বাস নিঃশেষিত প্রায়,
দুহাতে মুখ ঢেকে চেয়ে দেখলাম
আমার অস্তিত্বে তুমি আদিগন্ত উদ্ভাসিত ॥

দানিকেনের বক্তব্য—একটি সম্ভাব্য প্রকল্প

প্রশান্ত শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

“সত্যমেব জয়তি নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥”
[মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৬]

দৃশ্য জগতের অন্তরালের তিমির-নিবিড় রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনে এবং মানবজীবনের প্রাণযাত্রার ধারাবাহিকতার সূত্রানুধাবনে পরিচিত মতবাদ এবং বক্তব্যগুলি পৃথিবীতে যে জাতীয় সাড়া জাগিয়েছিল

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দানিকেনের অভিনব পর্যালোচনাটিও বোধ করি তার চেয়ে কম আলোড়ন, বা কম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেনি।

দ্বিতীয় তুষার-যুগের উদ্‌ভ্রান্ত সৃষ্টির ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে পৃথিবীর বুকে ইতস্ততঃ পদচারণা করে বেড়াল পিথেক্যান্‌থ্রোপাসরা। সুপ্রাচীনকালের সঘনারণ্যক প্রদেশের ছায়াবৃত—অবগুণ্ঠনের মধ্যে সহসা দেখা মিলত সেই সুদীর্ঘ, বলিষ্ঠ, রোমশ হাইডেলবার্গ দলের। দক্ষিণ ইউরোপের বৃক্ষবিরল তুন্দ্রাঞ্চলীয় উদ্ভিদ্‌দের মধ্যে বিরাটাকার ষাঁড় আর বল্‌গা হরিণের সঙ্গে অস্তিত্ব-রক্ষার পাঞ্জাকষাতে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে চলত নিয়াণ্ডারথালরা। পরবর্তীকালে উপমানবীয় বংশধরদের আর এক উন্নত পর্যায়ের আত্মপ্রকাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

কিন্তু তারপর ?

তারপর তারাও হারিয়ে গেল অরণ্যের নিবিড়-ক্ষেত্রে, তাদের পূর্বপুরুষদের চরণচিহ্ন অনুসরণ করে, রেখে গেল শুধুমাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু অভিজ্ঞান, তাও যৎসামান্য। প্রকৃতপক্ষে হারিয়ে যাওয়া প্রাণীরাও যে আমাদের পূর্বপুরুষ নয়, তাও আধুনিক গবেষণা ও যৌক্তিক নিরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু এরপরেই দেখা গেল মানবপ্রজন্ম। আর পাওয়া গেল প্রক্ষিপ্তভাবে, বিভিন্ন কাজের মধ্যে তার বৌদ্ধিক নিদর্শন।

উপমানবীয় প্রজন্মের পর মানব-জীবনের সহসা সূচনার যথেষ্ট ব্যাখ্যা বহুদিন পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত ছিল। এরিক্ ফন দানিকেন ঘটনাসঞ্চয় এবং তথ্যাদির সহায়তায় এই ‘হারানো সূত্রের’ (missing link) একটি যুক্তিনিষ্ঠ পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছেন।

বিষয়টির যথেষ্ট আলোচনার জন্য তিনি একটি প্রকল্পের অবতারণা করেছেন। প্রকল্পটি হল—দেবতারা গ্রহান্তর থেকে পৃথিবীতে আসেন ও জেনেটিক কোডের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। এর ফলেই সম্ভব হয়েছে বিবিধ আবিষ্কার, বিভিন্ন যুগান্তকারী উদ্ভাবন। এখন একটি প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে দানিকেনের প্রকল্পটি কতটা বৈজ্ঞানিক ? তাঁর বক্তব্যটিকে যাচাই করতে হলে আমরা কতকগুলি অনুমান করতে পারি। ব্যাপারটা এরকম হয় যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সত্যতা নিরূপণ করতে হলে আমরা বহির্বিশ্বের ঘটনা বা ঘটনাবলীর সাহায্যে তাদের বক্তব্যগুলিকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। একটি উদাহরণ নিলে বক্তব্যটি পরিষ্কার হতে পারে—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম রাস্তায় জল পড়ে আছে, আমি মনে করলাম বুঝি বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল, না বৃষ্টি হয়নি। একজন লোক হোস্ পাইপ দিয়ে জল দিচ্ছে। এইভাবে আমরা প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারি।

দানিকেনের প্রকল্পটিকে কিন্তু আমরা এভাবে বিচার করতে পারি না। এটিকে বিচার করতে হলে, আমাদের প্রাচীনযুগে ফিরে যেতে হয় এবং দেখতে হয়, তার বিবেচনাটি যথার্থ কিনা। এ জাতীয় কাজ করা যে খুবই অসম্ভব তা আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি। আসল কথাটা হল এই যে,

ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা এ জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হই। বিষয়টি পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যে ঐতিহাসিক প্রকল্পগুলির কোনদিনই সন্দেহাতীত হওয়ার আশা থাকে না, থাকে সম্ভাবনার আশা, হয়ত আরেকটুকু বেশী বললে, খুবই সম্ভব হওয়ার আশাকে এক্ষেত্রে দুরাশা বলা যায় না। ধরা যাক্ সিন্ধু-সভ্যতার পতনের কারণ। কেউ কেউ বলেন আর্যদের আক্রমণের ফলেই এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। আবার শহরকেন্দ্রীক সভ্যতার আবেদন অনুমোদন করতে গিয়ে ক্রমাগত শ্যামলবনানীর উচ্ছেদ বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতায় মরুভূমির জন্ম দিল। কোন কোন ঐতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার পতনের এটিকেই এর কারণ বলে নির্দেশ করতে চান। পুনরায় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করতে চান যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সিওয়ান অঞ্চলে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত হতে থাকে। সেখানে বিস্তৃতক্ষেত্র জুড়ে দশকের পর দশক ধরে জল দাঁড়িয়ে থাকে। এর ফলে সেই আরক্ষজল ক্রমাগত শহরাঞ্চলে প্রবেশ করে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিই যে সিন্ধুসভ্যতার পতন সূচিত করেছে তা অনেকেই মনে করেন।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে এর কোন একটিকেই আমরা সিন্ধুসভ্যতার পতনের একমাত্র কারণ বলে দাবি করতে পারি না।

ঐতিহাসিক প্রকল্পের মতই কিন্তু দানিকেনের প্রকল্পটির অবস্থা। দানিকেনের প্রকল্পটি কতটা যুক্তিনিষ্ঠ, তা বলার আগে বলা প্রয়োজন প্রকল্প বলতে আমরা কি বুঝি এবং কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে আমরা কোন একটি বক্তব্যকে প্রকল্প বলতে পারি। প্রকল্প হল একটি বিশেষ বচন, যা কল্পনাশ্রয়ী হয়েও যুক্তিনিষ্ঠ আনুমানিক ধারণা। এর তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে : (১) এটি কম কল্পনাশ্রয়ী হবে, (২) এর দ্বারা অধিক ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব, এবং (৩) এটি বাস্তবাশ্রয়ী হওয়া উচিত।

এখন বিচার করে দেখা যাক দানিকেনের বক্তব্যটি একটি প্রকল্প কিনা। দানিকেনের বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে কম কল্পনাশ্রয়ী। এর মধ্যে একেবারেই কল্পনা নেই তা বলা ঠিক হবে না, কিন্তু কল্পনার উপাদান এতে কম। দ্বিতীয়তঃ দানিকেনের আলোচনাটির দ্বারা 'হারানো সূত্রের' যেমন ব্যাখ্যা সম্ভব, তেমনি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ব ইতিবৃত্তের বহু ঘটনার সুস্পষ্ট আলোকপাতও সম্ভব হবে। তৃতীয়তঃ তাঁর আলোচনাটি সন্দেহাতীতভাবে বাস্তবানুগ।

দানিকেন বস্তুতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে, বিবিধ কিংবদন্তী, কথা-কাহিনী ও প্রচলিত ধারণার অনুসন্ধান করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের পাতা খুঁজেছেন। সংগ্রহ করেছেন রামায়ণ ও মহাভারত থেকে বিচিত্র তথ্য। গহ্বরের অন্ধকারে, জনপদ-পরিত্যক্ত প্রত্যন্তক্ষেত্রে প্রবেশ করে তিনি তার বক্তব্যের রসদ জোগাড় করেছেন।

দিল্লীর কুতুবমিনার চত্বরে চার হাজার বছরের মরচেহীন লৌহস্তম্ভ, বন্দীদের উপর মায়া পুরোহিতদের শল্য-চিকিৎসা, দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডরের মাটির নীচেকার প্রশস্ত স্বর্ণকক্ষ, মহাকাশযানের ছবিসদৃশ ব্লু মাউন্টেনসে আবিষ্কৃত পাহাড়ের গায়ে আঁকা ছবিগুলি অঙ্গুলী নির্দেশ করে তাঁর বক্তব্যটি প্রকল্প কিনা সেই দিকে।

এইভাবে দানিকেন তাঁর প্রকল্পের বয়ান নির্মাণ করেছেন। নাসার অধিকর্তা ব্লুমরিশও বলেছেন যে ইজেকিয়েলের বর্ণিত প্রতিবেদনে মহাকাশযান সম্পর্কিত যে তথ্য আছে তার সঙ্গে নাসার ল্যাংলী রিসার্চ সেন্টারের রজার এ অ্যাণ্ডারসনের গবেষণার (১৯৬৪) বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে দানিকেনের বক্তব্যটি একটি অপ্রতিরোধ্য প্রকল্প। আজ পর্যন্ত আমি এর কোন বিরুদ্ধ প্রকল্পের সঙ্গে পরিচিত হইনি। তবে এক্ষেত্রে একরম মনে করা অন্যায় হবে যে কেবলমাত্র এখন পর্যন্ত যার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না বা যার বিরোধিতা করা যায় না তাকেই যুক্তিনিষ্ঠ প্রকল্প বা বাস্তব বচন বলে গ্রহণ করতে হবে। যেমন—আমাদের জীবনের আদি অজ্ঞাত, জীবৎকাল পরিস্ফুট এবং মরণান্তর কালও অব্যক্ত। তাই আমাদের শোক করা উচিত নয় বা 'জীবন হল চলন্ত প্রচ্ছায়া'। এ জাতীয় বক্তব্যগুলিকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না ঠিকই। তা বলে এগুলিকে কি বাস্তব বচন বা প্রকল্প বলতে পারব ? সত্যিই পারব না। কারণ ? কারণটা খুবই সামান্য। যেহেতু এগুলিকে প্রকল্প বলে বা সত্য বলে মনে করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি নেই। (যদিও পূর্বোক্ত প্রাকল্পিক বৈশিষ্ট্যও এদের নেই।)

কিন্তু দানিকেনের প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ঘটনাটি অন্যরকম। তাঁর বক্তব্যের পিছনে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে তা আমি আগেই দেখিয়েছি। তবে দানিকেনের বক্তব্যটির বিরোধী কোন বক্তব্য ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় তাহলে দেখতে হবে সেটি এর প্রতিযোগী প্রকল্প কিনা। যদি তা হয় তাহলে দুটি বক্তব্যই প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত হবে।

তাই উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে দানিকেনের বক্তব্য একটি সম্ভাব্য প্রকল্প। এখন একটি প্রশ্ন ওঠে—দানিকেনের প্রকল্পটি কি ডারউইনীয় তত্ত্বকে বিরোধীতা করে ? বা, দানিকেনীয় প্রকল্পটি 'হারানো সূত্রের' ব্যাখ্যা দিতে কতটা সাহায্য করে ?

পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ডারউইনীয় তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। ১৮৫৯ সালে ডারউইন মানুষের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বললেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন বিবর্তনের একটি অন্যতম উপাদান। তাঁর তত্ত্বটি পাঁচটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল ঃ—

(১) **অতিরিক্ত প্রজনন ঃ** জ্যামিতিক হারে কীটপতঙ্গ এবং প্রাণীদের প্রজনন হয় থাকে। এক জোড়া মাছি একটি ঋতুতে ১,১৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি ডিম পাড়ে। কিন্তু খাদ্যাভাব, সীমিতক্ষেত্র এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অধিকাংশই ধ্বংস হয়।

(২) **পরিবর্তন (প্রয়োজনীয় বা নিষ্প্রয়োজনীয়) ঃ** ডারউইন মনে করতেন যে প্রাণী প্রজন্মের ধারাবাহিক ভাবে সুবাদে তার মধ্যে কিছু দৈহিক পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য এ জাতীয় পরিবর্তন কার্যকারী বা অকার্যকারী হতে পারে।

(৩) **অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম :** সীমিত ক্ষেত্র এবং অপব্যাপ্ত খাদ্য সঞ্চয়ের মধ্যে অতিরিক্ত প্রজননের ফলে পরিবেশগত অবস্থা, আভ্যন্তরিক গোষ্ঠী বা বিভিন্ন বহির্গোষ্ঠীর মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই বিস্তৃত হত। এইজন্যেই গণ্ডারের সিং, মৌমাছির হুলের সৃষ্টি হয়েছে।

(৪) **যোগ্যতমের অস্তিত্ব :** অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে যখন অধিকাংশ প্রাণীই বিনষ্ট হয় তখন প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যে প্রাণীরা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে তারাই বেঁচে থাকে।

(৫) **প্রাকৃতিক নির্বাচন :** ডারউইন মনে করতেন যে যাদের একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা আছে, প্রকৃতি তাদেরই নির্বাচন করে এবং তারপরই পৃথিবীতে তাদের বংশবৃদ্ধি করে চলে।

দানিকেনের বক্তব্য এবং ডারউইনের তত্ত্বটি বিচার করলে আমরা স্পষ্টতঃই বুঝতে পারি যে এরা পারস্পরিক বিরোধী দুটি বক্তব্য নয়। এজাতীয় আলোচনা অনেক সময় দানিকেন ও ডারউইনীয় বক্তব্যগুলিকে যথাযথভাবে যে প্রকাশ করতে পারে না তা অনেকে মনে করেন।

আমি এখনও পর্যন্ত যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে আলোচনা করে আসি তাহলে এটাই প্রমাণ করে যে দানিকেনের বক্তব্য একটি সম্ভাব্য প্রকল্প। আলোচনাটির সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ হয়ত মানব যাত্রার বিবর্তমান চিত্রের দিকে তাকিয়ে বলতে চান দানিকেনের বক্তব্য ডারউইনীয় তত্ত্বের বিরোধী, সাপ-নেউল সম্পর্কের মত। কেউ কেউ আবার এ জাতীয় সমস্যাকে সমস্যা বলে মনেই করেন না, উপরোক্ত দানিকেনীয় প্রাকল্পিক অনুমান ডারউইনীয় অনালোকিত 'হারানো সূত্রের' ব্যাখ্যা দেয় বা অন্ততঃপক্ষে সাহায্য করে তার ওপরে জোর দেন।

এ বিষয়টিকে বিশদ আলোচনার আসরে না টেনে এতটুকু মাত্র বলা যায় যে পুর্বোক্ত দুটি বক্তব্যই ভিত্তিহীন, বিশ্লেষণাত্মক বিচার পরিত্যক্ত। একটা উদাহরণ নিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারে—x নামে এক ব্যক্তি বললেন মানুষ একদিনে বড় জোর ৩০ মাইল হাঁটতে পারে (সমতল ক্ষেত্রে)। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেল যে তার বক্তব্যটিই ঠিক। তবে কিনা এই সময় y নামে আর এক ব্যক্তি বললেন রণপা দিয়ে একজন লোক দিনে ৫০ মাইল অতিক্রম করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে এ দুটি বক্তব্য কি বিরোধী বা দ্বিতীয় বক্তব্যটি প্রথম বক্তব্যকে কি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। x এর বক্তব্য সাধারণতঃ হাঁটার মধ্যে সীমায়িত ছিল—কোন কৃত্রিম উপায় অভিযোজন এক্ষেত্রে অনোদ্ধৃত। y কিন্তু কৃত্রিম উপায় সংযোজনের কথাই বলেছেন। এক্ষেত্রে ব্যাপারটিও ঠিক তাই। ডারউইন বলেছেন স্বাভাবিক বিবর্তনের কথা আর দানিকেন জোর দিয়েছেন কৃত্রিম পরিবর্তনের ওপর। অনাগত দিনগুলির অপরিচিত বিচারের আশায় তাই দানিকেন বসে আছেন।

ক্যান্সার

শুভা কর

ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেল। বনলতা চা ভিজিয়ে দিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিল। সচরাচর এতটা বেলা সোমেশ্বর করেন না। রোদ বাড়ার আগেই ফিরে আসেন। বাতিকগ্রস্ত না হলেও সোমেশ্বর সাবধানী ; নিয়মমাফিক চলতে ভালবাসেন।

বৈশাখের গোড়ার দিক চলছে। জামসেদপুরে এসে বনলতা দেখছেন এখানে ভোরের আলোর রেশ কাটতে না কাটতেই রোদের প্রচণ্ড তেজ বাড়ে। সোমেশ্বর এমনি-এমনিই কি রোদ মাথায় লাগিয়ে ঘুরবেন! মনে মনে সামান্য উদ্বেগ বোধ করছিলেন বনলতা। এমন সময় দেখলেন সোমেশ্বর আসছেন। এ বয়সেও শরীর এতটুকু ভেঙ্গে পড়েনি। যথেষ্ট লম্বা হওয়া সত্ত্বেও সোমেশ্বর কখনো কুঁজো হন না। বড় বড় পা ফেলে সোমেশ্বর কাছে এসে বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। মুখ সামান্য লালচে। অল্পস্বল্প ঘামের বিন্দু কপালে। তাঁর মুখ দেখে মনে হল না তিনি ক্লান্ত অথবা অসুস্থ। বনলতা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন।

স্বামীর রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত দেরী ?'

'হয়ে গেল,' সোমেশ্বর চশমা মুছতে মুছতে জবাব দিলেন।

রান্নাঘর থেকে ততক্ষণে দোলন এসে গেছে, সোমেশ্বরের পুত্রবধূ। সোমেশ্বর জানেন দোলন এক্ষুণি বকুনি লাগাবে। ইদানীং শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বলে ডাক্তার দেখাতে ছেলের কাছে এসেছেন। দোলনের শাসন এখন তাই দ্বিগুণ। সোমেশ্বর তাই দোলনকে দেখেই ছেলেমানুষী গলায় বললেন, 'দোলন, দেখে এসো তোমার জন্য কি ফার্স্ট ক্লাস জিনিস এনেছি।'

দোলন সামান্য অবাক হল। কিছুই তার চোখে পড়ছে না।

'মালির কাছে রেখে এলাম। ইয়া বড় বড় গলদা।'

বনলতা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'তুমি বাজার হয়ে আসছ ? তাই এত দেরী। এদিকে আমি ভেবে মরছি।'

দোলনও হেসে ফেলেছে। বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, হাসতে হাসতেই বনলতাকে বলল, 'বকুনির ভয়ে বাবা ঘুষ দিচ্ছেন। তাই না, বাবা ?'

'তোমার হাত থেকে পার পাওয়া মুস্কিল দোলন।' সোমেশ্বর কপট বিমর্ষ হয়ে মাথা দোলালেন। 'আসলে নন্দীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওই যে গো—আমাদের বার্নপুরের নন্দী। এখানে মেয়ের কাছে এসেছে। ওই টানতে টানতে বাজারে নিয়ে গেল। কতদিন বাদে দেখা, গল্প ফুরোতেই চায় না।' সোমেশ্বর ঝাপসা ভাবে হাসলেন। 'বুঝলে দোলন, বার্নপুরে কি ভাবে ছিলাম। বন্ধু, বান্ধব, ক্লাব, ফ্যাক্টরী। বেশ রমরমা ছিল। এখন একেবারে ফাঁকা—বড় নিঃসঙ্গ।'

বনলতা সামান্য ক্ষুব্ধ হলেন, 'তুমিই তো ঘাটশিলা, ঘাটশিলা করে মাথা ছিঁড়ে খেলে। তখন সবসময় আওড়াতে পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেও। কতবার বললাম, ওই রকম ফাঁকা জায়গা, ঐ বন জঙ্গলের দেশে তুমি থাকতে পারবে না। তখন তো বাপু জেদ করে বাড়িটি ওখানেই বানালে। কি না, রিটায়ার্ড ম্যান। আমাদের কি আর শহরে মানায়! নিরিবিলিতে থাকব ; ভগবানের নাম করব।'

'তোমার স্মরণ শক্তি এ বয়সেও বেশ ভাল বনো।' সোমেশ্বর তারিফের গলায় বললেন। দোলন জোরে হেসে উঠল। বনলতাও হেসে ফেললেন। সোমেশ্বর বেচারার মত মুখ করেই বললেন 'দোলন, তুমি জান বন্যেরা বনে সুন্দর,' দোলন মাথা নাড়ল। 'তবে, তুমিই বলো বনলতার সৌন্দর্য কোথায় খুলবে ?' দোলন হাসতে হাসতে নুয়ে পড়ছিল। বনলতা তেড়ে উঠেছিলেন।

সোমেশ্বরকে বাঁচিয়ে দিল ধ্রুব। বরাবরের লেট রাইজার তাঁদের ছেলে। ঘুম থেকে সদ্য ওঠার দরুণ মুখ বেশ ফোলা। মাথার চুল এলোমেলো। সোমেশ্বর ছেলের দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। ধ্রুবর চেহারা বাবার মতই লম্বা, ছিপছিপে। ধ্রুবর মুখে সোমেশ্বর নিজের যুবক বয়সের

ছায়া দেখতে পেলেন। সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। চমক ভাঙল চেয়ারের শব্দে। ধ্রুব বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, এত হাসি কিসের ?'

বনলতা ছেলেকে চা এগিয়ে দিতে দিতে কড়া চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। সোমেশ্বরের মুখের ভাবে মনে হলো স্ত্রীর ধমক তিনি মেনে নিয়েছেন। ছেলের দিকে ফিরে বললেন, 'ও কিছু না, তুমি খেয়ে নাও। আমরা তোমার মার সঙ্গে সামান্য রসচর্চা করছিলাম।' ধ্রুব গলা ছেড়ে হেসে উঠল। দোলন বিপদ বুঝে পালিয়েছে।

আজ রবিবার। চায়ের আসর শেষ হতে বেলা হয়ে গেল। ধ্রুব বাবার কাছে বসে। সোমেশ্বর ডিভানে আধশোয়া হয়ে আছেন। বাজার থেকে সিগারেট আনতে ভুলে গেছেন। বাধ্য হয়েই ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাছে সিগারেট আছে ?'

ধ্রুব স্থির চোখে বাবাকে দেখল। সোমেশ্বরের চোখে ধুলো দেওয়া কঠিন। ধ্রুব তাই কোন ব্যস্ততা দেখাল না। নিস্পৃহ স্বরেই বলল, 'থাক না, বাবা ; দুদিন সিগারেট বন্ধ রেখে দেখ। হয়ত গলার ট্রাবলটা কমতে পারে।'

'তুমি কি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছ ?'

ধ্রুবকে খুব সাবধানী হতে হবে। বাবার অনুভূতি বড় তীক্ষ্ণ। ধ্রুব হালকা গলাতেই বলল, 'হ্যাঁ, কাল একবার গিয়েছিলাম।'

'রিপোর্টগুলো দেখিয়েছ ?'

'হ্যাঁ। সি. এম. ও-র কাছেই গিয়েছিলাম।'

'কি বললেন ?'

ধ্রুব প্যাঁচে পড়ে যাচ্ছে। কি বলবে বাবাকে, ধ্রুবর অসহায় লাগছিল। এ ধরণের মানুষের চোখ এড়ানো বড় শক্ত। সোমেশ্বর সোজাসুজি, স্পষ্ট কিছু জানতে চাইছেন। ধ্রুবর সন্দেহ হচ্ছিল বাবা হয়ত বুঝতে পেরেছেন। বাবাকে ধ্রুব জানে। সোমেশ্বরের আচরণে কোনদিন মনের কথা টের পাওয়া যায় না। মানুষটা ভেতরে ভেতরে ভাঙতে সুরু করলেও ধ্রুব জানতে পারবে না।

'কি হল, বললে না ?' সোমেশ্বর আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'কি আবার বলবেন। রিপোর্ট দেখে তো সব বোঝা যায় না। পেশেণ্টকে আগে দেখতে হবে।'

'কবে নিয়ে যাবে আমাকে ?'

'যাব,……গেলেই হল একদিন,' অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ধ্রুব।

মিস্টার রায় বাবাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে বলছেন। রিপোর্ট দেখে মনে হয় রোগটা পাকিয়েছে। সোমেশ্বরকে দেখে বোঝা যায় না। আগের মত স্বাস্থ্য এখন নেই। সামান্য রোগা হয়ে গেছেন। তবু চোখে মুখে কোথাও অসুস্থতার ছাপ নেই। এখনও সোমেশ্বর পায়ে হেঁটে

অনেকটা বেড়িয়ে আসেন। দুর্বলতাও তেমন আছে বলে মনে হয় না। এ বয়সেও সোমেশ্বরের শরীর ঝুঁকে যায়নি। বাবাকে দেখতে দেখতে ধ্রুবর মনে হল মানুষের অসুখটা যতটা শরীরে, ততটা মনে। সোমেশ্বর সবসময়ে ফুর্তিতে থাকেন। শরীরের কষ্টকে তেমন প্রাধান্য দেন না। ধ্রুব বুঝতে পারল না এ অসুখ বাবার মনে কোন ছাপ ফেলেছে কি-না।

ঘর নিস্তব্ধ। একটানা পাখার আওয়াজ হচ্ছে। সোমেশ্বর শুয়ে আছেন। মনে হল ধ্রুব কিছু জিজ্ঞেস করল। সোমেশ্বর ছেলের দিকে তাকালেন 'কিছু বললে ?'

'তোমার কিছু খেতে কি কষ্ট হচ্ছে ?'

'প্রথম প্রথম হচ্ছিল। তখন লিকুইড খাচ্ছিলাম। এখন দেখছি ব্যাথাটা তেমন নেই। মাঝে মাঝে লাগে, কাঁটা বেঁধার মতো। তুমি বরং একটু নরম জিনিষ খেয়ো। শুধু শুধু ব্যাথায় খোঁচা দিয়ে লাভ নেই।'

'ডাক্তার বললেন ?'

'ডাক্তার !···না, ঠিক বলেননি। তবে জিজ্ঞেস করছিলেন সহজেই কি খেতে পারো। আমার মনে হয় রুটি-টুটি তুমি খেয়ো না। অবশ্য দুধে ভিজিয়ে নিতে পারো।'

ছেলের দ্বিধা, অন্যমনস্কতা সোমেশ্বর লক্ষ্য করছিলেন। ধ্রুব ভয় পেয়েছে। গলার সামান্য একটু গ্রোথ সবাইকেই বেশ বিব্রত করছে। সোমেশ্বর জানেন এই হাসিখুশী সংসারের পেছনে একটা ছায়া ভাসছে। যতক্ষণ এদের সামনে থাকেন সোমেশ্বর রোগ, যন্ত্রণার কথা বলেনই না। তবু এরা চিন্তিত।

'বাবা,' ধ্রুব আস্তে ডাকল। সোমেশ্বর তাকালেন। 'ভাবছি তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাব। ওখানে কত ডাক্তার। নানা রকম চেক আপের ব্যবস্থা আছে।···সামনের উইকেই যাই, কি বল ?'

'তোমার চেনাশোনা কেউ আছেন ?'

'আছেন। তা ছাড়া আমি রায়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে সব ব্যবস্থা করব।'

'তুমি তো বলছ, এটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়।'

'হ্যাঁ···না···মানে···তবু, দেখিয়ে নেওয়া ভাল। হাজার হোক বয়স হয়েছে। দেখাতে তো দোষ নেই।'

সোমেশ্বর হাসলেন। ধীরে ধীরে ছেলের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। ধ্রুবর মাথায় হাত রাখলেন সোমেশ্বর। যেন অভয় দিতে চাইছেন। সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

'তুমি যাবে না বাবা ?'

'যদি তুমি জোর কর—যাব। তবে আমার মনে হয় বয়স হচ্ছে বলেই আর ছোটাছুটি করা ঠিক নয়। অনেক কাল কাটিয়েছি। আর কেন ?' সোমেশ্বর আর দাঁড়ালেন না।

* * * * * *

বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাস সামান্য ভিজে ভিজে। বৃষ্টি বাদলা দেখে সোমেশ্বর আর বেরোয়নি। বনলতা দোলনের সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছিলেন। ওদের ফিরতে দেরী হল। সোমেশ্বরদের শুতে শুতে প্রায় সাড়ে দশটা বাজল। ধ্রুব ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ আগামী সপ্তাহে কলকাতায় যেতে হবে। সোমেশ্বর বুঝলেন ছেলে এত সহজে ছেড়ে দেবে না। বনলতাও জোর করছেন। বনলতাকে কেউ কিছু বলেননি। উনি ভাবছেন এটা বোধহয় টনসিলের ব্যাপারে, চিরটাকাল তো এতেই ভুগছেন সোমেশ্বর। ছেলের এই জোর সোমেশ্বরের ভাল লাগল। চেষ্টায় হয়ত ফল নেই তবু ধ্রুব বসে থাকবে না। ছেলে এত বড় হবার পরও সোমেশ্বর সন্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনা পাননি। ধ্রুব বাবার কাছে এখনও সেই ছোট্ট ছেলে।

সোমেশ্বরের গরম লাগছিল। সব জানালাগুলো বন্ধ। বনলতাকে ডেকে সোমেশ্বর একটা জানালা খুলতে বললেন। বনলতা জলের গ্লাস, ওষুধগুলো গুছিয়ে রাখছিলেন। সোমেশ্বরের কথা শুনে বললেন, কি দরকার। এই তোমার গলা ব্যথা। ভিজে হাওয়ায় বাড়বে। বরং পাখাটা বাড়িয়ে দিই।

'না, না, ঘরের হাওয়া বড্ড গরম হয়ে গেছে। তুমি বরং জানালাটা খুলেই দাও।'

বনলতা শার্সিটা খুলে দিলেন। সোমেশ্বরের মনে হল এবার ধীরে ধীরে বনোর কাছে কথাটা পাড়া যাক। ওরও মনের প্রস্তুতি থাকা দরকার। বনলতা জানেন না স্বামীর এ অসুখ বড় মারাত্মক। চিরকাল সোমেশ্বরের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। বনলতার বয়স হলেও মনের তেমন পরিণতি হয়নি। এখনও ছেলেমানুষের মত ভাবেন পনেরো বছর বয়স থেকে যে সোমেশ্বর তাঁর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন হঠাৎ তাঁর হাতটা ফসকে যেতে পারে না। বনোর কাছে ধীরে ধীরে জানান দিতে হবে। কথাটা কি ভাবে সুরু করবেন সোমেশ্বর ভাবলেন। বনলতা ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। সামান্য চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। বনলতা বিছানায় উঠে বালিশটা ঠিক করে নিলেন। সোমেশ্বরের মনে হল এই প্রায়-অন্ধকারেই বলা ভাল। ভাল করে মুখ দেখা যায় না। এই সুযোগে হয়ত বলতে পারবেন। মানুষ বোধহয় কোন গভীর কথাই—আলোয় বলতে পারে না। তা লজ্জার হোক, অথবা দুঃখের, কিম্বা সুখের।

'বনো,' মৃদু স্বরে ডাকলেন তিনি।

বনোর ঠাকুর প্রণাম শেষ হয়ে গিয়েছিল, হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে বললেন, 'কি বলছ ?'

—'দেখ, তোমার কি মনে হয়—কলকাতায় গেলে আমার ভাল হবে ?'

'বারে, না হবার কি আছে ? আজকাল আবার কোন অসুখ না সারে তা ছাড়া সবাই তো বলছে এ কিছু নয়। আমার মনে হয় এও তোমার টনসিল থেকেই কিছু হয়েছে। তা ছাড়া তোমার ব্যথা এখন অনেক কম। তাই না ?'

'তোমার মনে হচ্ছে আমি ভাল হব ?'

বনলতা স্বামীর গায়ে হালকা চাদরটা টেনে দিতে দিতে বললেন, 'দেখ, আর এই অসুখ নিয়ে মাতামাতি কোরো না তো। শরীর থাকলেই এমন টুকটাক অসুখ সবারই হয়।'

বনো, আমার বোধহয় ক্যান্সার হয়েছে,' বলে অল্প হাসলেন সোমেশ্বর। অন্ধকারে সামান্য হাসির শব্দ শুনলেন বনলতা।

মানুষটা চিরকাল এমন ঠাট্টা তামাশা করে ভয় দেখায়। তা বলে অসুখ নিয়ে ঠাট্টা বনলতার ভাল লাগে না। তিনি সোমেশ্বরের মুখে হাত চাপা দিয়ে দিলেন, 'বুড়ো বয়সেও দেখছি ফ্যাসানের কমতি নেই ?'

'এর মধ্যে ফ্যাসানের কি দেখলে ?'

'তা ছাড়া কি ? নিত্য নতুন জামাকাপড়ের মতন নতুন নতুন রোগ বেড়োচ্ছে। আজকাল আবার ক্যান্সারের ফ্যাসান বেরিয়েছে।'

স্ত্রীর রসিকতা সত্যিই উপভোগ্য, কিন্তু সোমেশ্বর আজ হেরে যাচ্ছেন। বনলতা বিশ্বাস করলেন না। সামান্য একটা ফুসকুড়ি যে মারাত্মক ধ্বংস করতে পারে প্রাচীন বনলতা তা জানেন না। সোমেশ্বর দেখলেন বনো শুয়ে পড়েছে।

রাত ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। চাঁদের ক্ষীণ আলো বিছানায় লুটিয়ে আছে। ঘুমের ঘোরে বনলতা মাঝে মাঝে পাশ ফিরছেন। শাড়ীর শব্দ উঠছে। একটানা ভ্রমর গুঞ্জনের মত পাখার আওয়াজ। সোমেশ্বর ঘুমোতে পারেননি। ধীরে ধীরে জানালার পাশে উঠে এলেন। বৃষ্টি হয়েছে। বাতাসে ভাসছে ভিজে মাটির গন্ধ। বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন সোমেশ্বর। পৃথিবীর বুকের গন্ধ নতুন করে অনুভব করছেন। বেলফুলের গাছে কুঁড়ি ফুটছে, একটা দুটো। মায়াবী পৃথিবীর আকর্ষণ সোমেশ্বর বুঝতে পারছেন। বিছানায় চাঁদের আলো। ঘুমন্ত বনলতার ভঙ্গী কত নিশ্চিন্ত।

পৃথিবীর গভীর মায়া, করুণা, নির্ভরতা সোমেশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে আলিঙ্গন করছে। ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছেন তাঁর দৃঢ়তা এবং প্রস্তুতি। সোমেশ্বর ঘুমন্ত স্ত্রীর কাছে এগিয়ে আসছেন। অল্প আলো বনলতার মুখে এসে পড়েছে। চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও সোমেশ্বর স্ত্রীকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন না। বনলতার অবয়ব ঝাপসা হয়ে আসছে। জলের ওপর ভাসমান ছবির মতো শুধু অস্পষ্ট ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।

ধূমপান নাই বা করলেন !

বিশ্বনাথ দাস

অভ্যাসটি হয়তো আপনার একান্ত প্রিয় । হয়তো আপনার ধারণা, ধূমপান আপনার সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়েছে । কিংবা আপনি বিশ্বাস করেন, স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমন করতে, চিন্তায় একাগ্রতা আনতে কি ক্লান্তি অপনোদনে এমন একটি 'টনিক' আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না । সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্যের শিরোনামটি যে আপনার যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করবে, সে সম্বন্ধে আমি বিলক্ষণ সচেতন ।

আসলে তামাকুসেবনের মত এমন একটি 'চমৎকার' ব্যাপার—যার শুরু শোনা যায় সেই সুদূর ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে এবং সেই থেকে পৃথিবীর নানান প্রান্তের তাবৎ জ্ঞানীগুণী, মণিষী সজ্জনের মধ্যে যার এত কট্টর অনুরাগী ভক্ত রয়ে গেছেন—সেটির বিরুদ্ধে হঠাৎ হঠাৎ এমন পৃথিবী ব্যাপী জেহাদ শুরু হয়ে গেল কী ক'রে ব্যাপারটি ভেবে আমি নিজেও রীতিমত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভেবে দেখুন, ইওরোপ আমেরিকার বাঘা বাঘা সব দেশের সরকারকুল তারস্বরে তামাকুসেবনের অপকারিতা সম্বন্ধে তাদের নাগরিকদের সচেতন ক'রে দেওয়া শুরু করেছে। খোদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (World Health Organisation) নাকি এবাবদে রীতিমত ভাবিত এবং উদ্বিগ্ন! ইটালিতে সিগারেট এবং তামাকের বিজ্ঞাপণ দেওয়া আইনবিরুদ্ধ হয়ে গেল এবং খবরে প্রকাশ (*The Statesman*, 11 January 1976), ধূমপান ব্যাপারটির সূতিকাগার খাস ইংলণ্ডেই নাকি ধূমপান নিরুৎসাহিত করার জন্য আইনের আশ্রয় নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে! আমাদের দেশেও শোনা যাচ্ছে সিগারেট কোম্পানীগুলো 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' এই সতর্কবাণীটি সিগারেটের প্যাকেটে ছাপা শুরু করেছে এবং জনসাধারণকে ধূমপানের ব্যাপারে নিরুৎসাহী করার একটা কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে এই ছাপাটা বাধ্যতামূলক করতে শীগগীরই নাকি আইনও তৈরি হতে চলেছে!

এইসব খবর থেকেই কৌতূহল। এবং তারপর যা হয়—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যেসব তথ্য বেরিয়ে পড়ল সেগুলো আর যাই হোক, নিরীহ নয় কোনমতেই, আর সেইজন্যই আপনার বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে জেনেও এই প্রসঙ্গটির অবতারণা।

ধূমপান ব্যাপারটির ওপর লোকের প্রথম সন্দেহ পড়ল ফুসফুসের ক্যান্সার নামক মারাত্মক একটি রোগের কারণ খুঁজতে গিয়ে। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দেখা গেল, হঠাৎ ক'রে এই রোগটি থেকে মৃত্যুর সংখ্যা সারা পৃথিবীজুড়ে বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে—এক আমেরিকাতেই ১৯৩০ সালের তুলনায় ১৯৬২ সালে প্রায় পনেরোগুণ বেশি! জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং রোগনির্ণয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি দিয়ে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কিছুটা হয়তো ব্যাখ্যা করা যায়—কিন্তু বাকি অনেকটা যে রোগটির সত্যিকারে প্রাদুর্ভাব বাড়িয়ে দেওয়ার মত কোন কারণ ঘটার নির্ভুল ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাতে আর সন্দেহ কী? এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে অনেকে ধূমপানের দিকে সন্দেহকুটিল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, এমন সময় ১৯৫২ সালে লণ্ডন স্কুল অব হাইজিনের ডঃ ব্রাডফোর্ড হিলের নেতৃত্বে একদল গবেষক তাঁদের একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ ক'রে মৌচাকে প্রথম ঢিলটি ফেললেন [4]। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে প্রায় ১৫০০ ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী এবং সমসংখ্যক অন্যান্য রোগে এবং আক্রান্ত রোগীদের ধূমপানের অভ্যাস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রে এই গবেষকদল দেখালেন, অন্যান্য রোগীদের তুলনায় ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ধূমপায়ীদের অনুপাত বেশ কিছুটা বেশী। এবং ধূমপায়ীদের মধ্যেও যারা একটু বেশীমাত্রায় ধূমপান করেন অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার ধূমপায়ীদের তুলনায় তাদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের অনুপাত অপেক্ষাকৃত বেশি। একই

ধরনের আরও কিছু সমীক্ষাতে হিলসাহেবের অনুমান সমর্থিত হল। ফলে ব্রিটিশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন ধূমপানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দাবী জানালেন, যত পয়সা খরচ হয় হোক্, মানুষের শরীরে ফুসফুসের ক্যান্সারের মত একটা মারাত্মক রোগ ডেকে আনার জন্য দায়ী এই পয়লা নম্বরের 'শত্তুরটির' বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সব রকম ব্যবস্থা নিতে হবে।

সব শুনে খ্যাতনামা রাশিবিজ্ঞানী স্যার রোনাল্ড ফিশার বেজায় চটে গিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর যুক্তি—ধূমপান এবং ফুসফুসের ক্যান্সার রোগের মধ্যে ধনাত্মক সংশ্রব (একটা বাড়লে অন্যটিও বাড়ে, এই অর্থে) পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলেই ধূমপানকে অভ্রান্তভাবে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে ধরে নিতে হবে, এ কেমন কথা? উল্টোটাই বা নয় কেন? এমনও তো হতে পারে, ফুসফুসের প্রদাহ ইত্যাদি ক্যান্সারের পূর্বলক্ষণগুলো যাদের মধ্যে সবে দেখা দিতে শুরু করেছে তারা হয়তো কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে ধূমপানের অভ্যাসটিতে জড়িয়ে পড়ছে—অর্থাৎ, ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়াই পরোক্ষভাবে ধূমপান অভ্যাসটি গড়ে তোলার জন্য দায়ী? এ ছাড়া আরও একটি সম্ভাবনা পড়ে থাকছে। সংশ্রব থাকা মানেই তো আর সবসময় কার্যকারণ সম্পর্ক থাকা নয়—তা যদি হতো তো দেশে স্কুটার উৎপাদন এবং ট্রেন রাহাজানির সংখ্যা এই দুটো ব্যাপারের মধ্যে সুস্পষ্ট ধনাত্মক সংশ্রব (দুটোই ক্রমাগত বাড়ছে) থেকে একটাকে অন্যটির কারণ ধরে নিয়ে অনায়াসে সুপারিশ করা চলত, ট্রেন-রাহাজানি কমাতে হলে এক্ষুণি দেশে স্কুটার উৎপাদন একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া দরকার! আসল কথা হল, অনেক সময় সংশ্লিষ্ট দুটো ব্যাপারের মধ্যে আপাত সংশ্রবের জন্য দায়ী হয় তাদের ওপর তৃতীয় কোন ব্যাপারের (ওপরের উদাহরণে সময়ের অগ্রগতির) প্রভাব। সুতরাং এও অসম্ভব নয় যে, মানুষের শরীরে দেহকোষের মধ্যে জিনের গঠনবৈচিত্র্যই হয়তো তাদের ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ায় অবস্থা এবং ধূমপানের অভ্যাস—এই দুটো ব্যাপারই প্রভাবিত করছে এবং এর জন্যেই হয়তো দুটো ব্যাপারের মধ্যে এই আপাত সংশ্রব। একপ্রস্থ বক্তৃতা এবং লেখার [3] মাধ্যমে ফিশার জোরগলায় দাবী জানালেন: জনসাধারণের পয়সা খরচ ক'রে তাদের মনেই ধূমপান সম্পর্কে অহেতুক ভয় নিপুণভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার মত জঘন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার আগে কার্যকারণ সম্পর্কটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরও নিশ্চিন্তভাবে যাচিয়ে নেওয়া দরকার।

দেখতে দেখতে নাটক জমে উঠল দিব্যি। হিলসাহেবের গবেষণার ফলে যারা ভয়ে ভয়ে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হাসি ফুটল সিগারেট কোম্পানী-গুলোর মুখেও, যারা আশঙ্কা করছিল তাদের ব্যবসায়ে এবার লালবাতি জ্বলবে। আর অন্যদিকে ফিশারসাহেবের সম্বন্ধে অভিযোগ তোলা হল—বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিকের একি অধঃপতন! সিগারেট কোম্পানীগুলোর পয়সা খেয়ে তিনি মানুষের সর্বনাশ করতে নেমেছেন।

কিন্তু নিন্দকেরা যাই বলুক, ফিশারের বক্তব্যে যে যুক্তিও রয়ে গিয়েছে কিছু, তাতো অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং পৃথিবীর নানান প্রান্তে শুরু হয়ে গেল মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ধূমপানের তথা তামাকুসেবনের (অন্যান্য ভাবে) সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক সমীক্ষা এবং গবেষণা আমাদের দেশেও বেশ কিছু কাজ হলো এ নিয়ে [2], [7], [8]।

এখন ফুসফুসে ক্যান্সারের মত মোটামুটি বিরল একটি রোগের কারণ ধূমপান কিনা এটা খতিয়ে দেখার কাজটা যে আদৌ সহজ নয়, সেকথা সবাই স্বীকার করবেন—বিশেষ করে যখন মানুষের ওপর প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মূলতঃ পরীক্ষাটি চালানো সহজবোধ্য কারণেই একেবারে অসম্ভব। ফলে মূলতঃ ডাক্তারী মতে পরীক্ষা এবং রাশিবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করেই যা কিছু কাজ হলো এবং এই সব কাজের মধ্যেও পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও প্রকৃতিতে তো বটেই, সম্পূর্ণতা, যৌক্তিকতা এবং তাৎপর্যের দিক থেকেও যথেষ্ট ফারাক রয়ে গেল। তাই পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এই সব বিচ্ছিন্ন গবেষণার ফলশ্রুতিগুলি একত্রিত করে খুব সতর্কতার সঙ্গে তা থেকে সাধারণ সত্যটুকু ছেঁকে বের করাটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ল।

এ ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে এলেন লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্। ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে এই কলেজের উদ্যোগে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হল এবং কমিটির ওপর ভার দেওয়া হলো এই প্রসঙ্গে এযাবৎ প্রকাশিত সমস্ত তথ্য খুঁটিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট পেশ করার। ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত হলো এই রিপোর্ট [10]।

আমেরিকাতেও এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল হার্ট ইনস্টিটিউট, আমেরিক্যান ক্যান্সার সোসাইটি এবং আমেরিক্যান হার্ট এ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে গঠিত একটি পর্যবেক্ষক দল ৫টি দেশে ১৮ বছর ধরে চালানো ১৬টি বিচ্ছিন্ন সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে যে রিপোর্ট পেশ করলেন সেটিতে আকৃষ্ট হয়ে আমেরিকা সরকার ঐ ১৯৬২ সালেই চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ণ, জীবনরসায়ণ এবং রাশিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করলেন। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর নানান প্রান্তে পরিচালিত মোট দু'ধরনের সমীক্ষার ফলাফল এই কমিটি বিশ্লেষণ করলেন—প্রথমতঃ বিশেষ একটি রোগে (যথা ফুসফুসের ক্যান্সার) আক্রান্ত রোগীদের ধূমপানের অভ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এরকম ২৯টি সমীক্ষা এবং দ্বিতীয়তঃ অধূমপায়ী এবং ধূমপায়ীদের মধ্যে সার্বিক (কারণ নির্বিশেষে) মৃত্যুহার এবং বিশেষ রোগ জনিত মৃত্যুহার তুলনা করা হয়েছে এরকম ৭টি সমীক্ষা। এই কমিটির রিপোর্টে প্রকাশিত হলো ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে [9]।

এইসব কমিটি কী রায় দিল জানার জন্য নিশ্চয়ই আপনার কৌতূহল এতক্ষণে আকাশ ছুঁয়েছে। না, আপনার আশান্বিত হওয়ার মত কিছু নয়। রয়্যাল কলেজের রিপোর্টে বলা হল,

ধূমপান যে ফুসফুসের ক্যান্সার ঘটানোর জন্য দায়ী এ ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রমাণ এত সুস্পষ্ট যে এই প্রসঙ্গে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নতুন আর কোন পরীক্ষার অবকাশ নেই। আমেরিকা সরকার নিযুক্ত কমিটির রিপোর্টেও (সার্জন জেনারেলের রিপোর্ট নামে এটা উল্লিখিত হয়ে থাকে) এটা সমর্থিত হলো। এই রিপোর্টেও সুস্পষ্টভাবে বলা হল: পুরুষদের ফুসফুসে ক্যান্সার ঘটানোর জন্য সিগারেটের ধূমপান যতখানি কাজ করে অন্য আর কোন কারণ তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না। মহিলাদের সম্বন্ধেও একই সন্দেহ করা যেতে পারে, যদিও এক্ষেত্রে লব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ এতখানি সুস্পষ্ট নয়। সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসটি যাদের মধ্যে যত বেশি পুরনো এবং যারা দিনে যত বেশি পরিমাণে সিগারেট খায়, তাদের এই রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। অভ্যাসটি যারা কিছুদিন পরে ছেড়ে দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি অধূমপায়ীদের তুলনায় সামান্য বেশি হলেও যারা ধূমপান এখনও চালিয়ে যাচ্ছে তাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। সিগারেটের ধোঁয়া যতখানি ক্ষতিকর, পাইপ বা চুরুটের ধোঁয়া ঠিক ততখানি নয়। আর ধূমপানের অভ্যাস ধরা বা গড়ে ওঠার জন্য জিনঘটিত শারীরবৃত্তীয় কোন কারণ আছে, এরকম কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ কমিটি পাননি। তবে অভ্যাসটি একবার শুরু করলে সেটা পরবর্তীকালে ছেড়ে দেওয়া যে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে তার জন্য কমিটির মতে দায়ী নিকোটিন নামক তামাকের ধোঁয়ার বিশেষ একটি উপাদানের কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের ওপর ভেষজিক প্রভাব।

সার্জন জেনারেলের রিপোর্টে যেসব পরিসংখ্যান উদ্ধৃত হয়েছে এই প্রসঙ্গে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিটি যেসব বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে ঐসব সিদ্ধান্তে এলেন সেগুলিতে দেখা যাচ্ছে, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আপেক্ষিক ঝুঁকি স্বল্পমাত্রার ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে ২.৪ থেকে বেশিমাত্রার ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে ৩৪.১ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এই রকম একটি সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যসার ১ নম্বর সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি ১। অধূমপায়ীদের তুলনায় বিভিন্ন ধরনের ধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আপেক্ষিক সম্ভাবনা।

(Haenszel এর সমীক্ষা, ১৯৬২ [5])

ধূমপায়ীদের ধরন	অধূমপায়ীদের তুলনায় ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আপেক্ষিক সম্ভাবনা
পুরুষ: দৈনিক ২০টার কম	৪.১
ঐ: দৈনিক ২০টার বেশি	১৬.৬
মহিলা: দৈনিক ২০টার কম	২.৫
ঐ: দৈনিক ২০টার বেশি	১০.৮

রিপোর্টে দেখানো হয়েছে অধূমপায়ীদের তুলনায় বিভিন্ন ধরনের ধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে মৃত্যুহারের অনুপাত বিভিন্ন সমীক্ষায় ৪.০ থেকে ৪৫.০ এর মধ্যে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি সমীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ২ নম্বর সারণিতে।

সারণি ২। অধূমপায়ীদের তুলনায় বিভিন্ন ধরনের ধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যান্সার জনিত মৃত্যুহারের অনুপাত।

(Doll এবং Hill এর সমীক্ষা, ১৯৫৬ [1])

ধূমপায়ীদের ধরন	অধূমপায়ীদের তুলনায় ফুসফুসের ক্যান্সার জনিত মৃত্যুহারের অনুপাত
যারা কোনদিন ধূমপান করেনি	১.০
যারা এখনও ধূমপান চালিয়ে যাচ্ছে (ধরন এবং পরিমাণ নির্বিশেষে)	১২.৮
দৈনিক ১–১৪ গ্রাম তামাক	৬.৭
দৈনিক ১৫-২৪ গ্রাম তামাক	১২.৩
দৈনিক ২৫ গ্রাম তামাক বা বেশি	২৩.৭
শুধু সিগারেট (পরিমাণ নির্বিশেষে)	২০.২
দৈনিক ১০টার কম	৪.৪
দৈনিক ১০-২০টা	১০.৮
দৈনিক ২১টা বা বেশি	৪৩·৭
পাইপ এবং চুরুট	৪.৬
যারা ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে	
১০ বছর বা তার কম	৮.৪
১০ বছরের বেশি	৫.০

এতো গেল ফুসফুসের ক্যান্সার বনাম ধূমপান পর্ব। এখন ধূমপান মূলতঃ ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য দায়ী কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে এই সব কমিটি নিয়োগ করা হলেও এদের রিপোর্টের ঝুলি থেকে দেখা গেল আরও অনেক বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। রয়্যাল কলেজের রিপোর্টে বলা হল, সিগারেটের ধোঁয়ায় যেসব রাসায়ণিক পদার্থ রয়েছে সেগুলোকে মোটামুটি-ভাবে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, প্রত্যক্ষভাবে ক্যান্সার ডেকে আনে বা এই রোগটি ত্বরান্বিত করে এমন কিছু পদার্থ, যথা পলিসাইক্লিক এ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন। দুই, নিকোটিন, যার কাজ দেহের রক্তপ্রবাহে একধরনের হর্মোণ ছেড়ে দিয়ে হৃদযন্ত্র, রক্তবহানালী প্রভৃতির ক্ষতি করা। তাছাড়া রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দনের গতি বাড়িয়ে, রক্তবহা সব নালী সঙ্কুচিত করে, রক্তে একধরনের স্নেহময় (fatty) এ্যাসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে এবং রক্ততঞ্চন (clotting of blood)

ঘটিয়ে নিকোটিন শরীরে হৃদরোগ ডেকে আনে। তিন, কার্বন মনক্সাইড জাতীয় পদার্থ, যার কাজ রক্তের অক্সিজেন পরিবহণের ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া এবং ধমনীর ভিতরকার আস্তরণ কিছুটা শক্ত করে দেওয়া। এবং চার, শ্বাসনালীর প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং ফুসফুসের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয় এরকম কিছু পদার্থ। শ্বাসকষ্ট এবং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিশ এই রোগ দুটির প্রধানতম কারণ সিগারেটের ধোঁয়ার এই শেষোক্ত দু'জাতীয় উপাদান। তাছাড়া ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিশে আক্রান্ত রোগীদের পক্ষে ধূমপান তাদের এই রোগ থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয় লক্ষণীয়ভাবে।

সার্জন জেনারেলের রিপোর্টেও এইসব সমর্থিত হল। এখানে আরও বিশদভাবে বলা হল, ধূমপান শুধুমাত্র ফুসফুসের ক্যান্সারই নয়, আরও কয়েক ধরনের ক্যান্সার এবং অন্যান্য কয়েকটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এবং এইসব রোগ থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। ৩ নম্বর সারণিতে এই রিপোর্টের কিছু প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান পরিবেশিত হল।

সারণি ৩। অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের (শুধুমাত্র সিগারেট) বিভিন্ন রোগ জনিত মৃত্যুহারের অনুপাত। (আমেরিকা সরকার নিযুক্ত কমিটির বিবেচিত দ্বিতীয় ধরনের ৭টি সমীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে)

রোগ	অধূমপায়ীদের তুলনায় সিগারেটপায়ীদের মৃত্যুহারের অনুপাত
ফুসফুসের ক্যান্সার (Cancer of lung)	১০.৮
ব্রঙ্কাইটিশ এবং এমফাইজেমা (Bronchitis & emphysema)	৬.১
স্বরযন্ত্রের ক্যান্সার (Cancer of larynx)	৫.৪
মুখগহ্বরের ক্যান্সার (Oral cancer)	৪.১
ইসোফেগাসের ক্যান্সার (Cancer of esophagus)	৩.৪
পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ক্ষত(Stomach & duodenal ulcers)	২ ৮
রক্ত পরিবহণ সংক্রান্ত অন্যান্য রোগ (Other circulatory diseases)	২.৬
প্লীহার সিরোসিস (Cirrhosis of lever)	২.২
মূত্রাশয়ের ক্যান্সার (Cancer of bladder)	১.৯
হৃদযন্ত্রের ধমনী সংক্রান্ত রোগ (Coronary artery disease)	১.৭
অন্যান্য হৃদরোগ (Other heart diseases)	১.৭
রক্তের উচ্চচাপ সংক্রান্ত রোগ (Hypertensive heart)	১.৫
ধমনীর প্রদাহজনিত রোগ (General arteriosclerosis)	১.৫
মূত্রগ্রন্থির ক্যান্সার (Cancer of kidney)	১.৫
কারণ নির্বিশেষে (All causes)	১.৬৮

এই সারণির একেবারে শেষের তথ্যটি থেকেই পাওয়া যাচ্ছে, কোন বিশেষ রোগের প্রসঙ্গে না গিয়েও সিগারেট থেকে ধূমপান মানুষের সাধারণ জীবনীশক্তি কমিয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করে। সাধারণভাবে যে কোন ধরনের ধূমপানের পক্ষেই এটা সত্য। এই প্রসঙ্গে প্রেস্টনের [6] গবেষণাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার ২৫টি রাজ্যের একলক্ষ নরনারীর ওপর অন্য একজন গবেষকের সমীক্ষার ভিত্তিতে পাওয়া ধূমপায়ী ও অধূমপায়ীদের মৃত্যুহারের ওপর কিছু গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তিনি দেখালেন, ধূমপান প্রত্যক্ষভাবে যে কোন বয়সের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা লক্ষণীয়ভাবে বাড়িয়ে দেয়—যেমন দৈনিক ১টা থেকে ৯টা সিগারেট খাওয়ার ফলে ৬৭ বছরের আগে এবং ৮৭ বছরের আগে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যায় যথাক্রমে ১০ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ এবং দৈনিক ৪০টা বা তার বেশি সিগারেট ধ্বংস করার ফলে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১ শতাংশ এবং ৪২ শতাংশ।

এইসব মারাত্মক রিপোর্ট সাধারণ মানুষের হাতে পড়ার ফল যা হবার তাই হল। সিগারেট বিক্রি পড়ে গেল হু হু করে। ধূমপায়ীরা হয় ধূমপান ছেড়ে দিলেন নয়তো ধূমপানের মাত্রা দিলেন কমিয়ে—নিদেনপক্ষে তামাকুসেবনের কম ক্ষতিকর কোন পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। সিগারেট কোম্পানীগুলো অপেক্ষাকৃত নিরাপদ সিগারেট উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রচলন হল ফিল্টার সিগারেটের এবং স্বল্পতর পরিমাণে টারপদার্থ আছে তামাকের বিকল্প এমন কিছু পদার্থ দিয়ে তৈরি সিগারেটের। তামাক শোধন প্রক্রিয়ারও উন্নতি সাধনের চেষ্টা চালানো হল। রাশিয়ার এক সিগারেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘লৌহ যবনিকা যুক্ত’ একধরনের সিগারেট তৈরি করে দাবী করল, এর মধ্যেকার অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত স্টেনলেস স্টীলের সূক্ষ্ম পাতটি তামাকের টারপদার্থ বেমালুম আটকে দেয়, অথচ ধোঁয়া বের হওয়ার কোন ব্যাঘাতই ঘটায় না। এবং ভারতীয় আমাদের একটা বিরাট লাভ হয়ে গেল এই সূত্রে—আমাদের একান্ত নিজস্ব ‘খাকি সিগারেট’ রাতারাতি কৌলীন্য অর্জন করে অভিজাতদের পকেটে এবং ঠোঁটে আশ্রয় পেল এবং সুদৃশ্য সৌখীন মোড়কের আড়ালে সাগরপাড়ি দিয়ে দিব্যি বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে আনতে শুরু করল।

এখন রোগ তো ধরা পড়ল, কিন্তু এর দাওয়াই ? যারা ধূমপানে নেহাতই আসক্ত হয়ে পড়েছেন তাদের কী উপায় হবে ? না, চিন্তার কিছু নেই। রয়্যাল কলেজের রিপোর্টে সে ব্যবস্থাপত্রও রয়ে গেছে। যাদের পক্ষে অভ্যাসটি চট করে ছেড়ে দেওয়া একান্ত অসম্ভব রিপোর্টে তাদের প্রতি উপদেশ ঃ কম সংখ্যায় সিগারেট খান ; কম পরিমাণে ধোঁয়া ভেতরে টানুন ; প্রত্যেক সিগারেট আরও কম পরিমাণে পোড়ান ; ধোঁয়া টানার ফাঁকে ফাঁকে সিগারেট আরও বেশিবার মুখ থেকে নামান ; কম পরিমাণে নিকোটিন এবং টার আছে এমন কোন ব্র্যাণ্ডের সিগারেট ধরুন। এইভাবেই এক দিন অভ্যাসটির হাত থেকে পুরোপুরি মুক্তি মিলে যাবে।

একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন নাকি ? হ্যাঁ, সেই ভাল। এতসব সাংঘাতিক ব্যাপার জেনে যাবার পরও আপনার একান্ত প্রিয় এই বিলাসটুকু আর চালিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না সেটা আর একবার ভেবেই দেখুন ভাল করে। বিশেষ করে রোজ রোজ না হক একগাদা পয়সা খরচের ব্যাপারটাও যখন জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে।

॥ নির্দেশপঞ্জী ॥

[1] Doll, R., Hill, A. B., Lung cancer and other causes of disease in relation to smoking. A second report on the mortality of British doctors. British Medical Journal, Vol 2. 1956.

[2] Dutta Chowdhuri, R., Roy, H., Gupta, B. K. S., Cancer of the larynx and hypobharynz—a clinicopathological study with spl. ref. to aetiology Journal of the Indian Medical Assocn., Vol. 32, 1959.

[3] Fisher, R. A., Smoking and the cancer controversy (some attempts to assess the evidence). Oliver & Boyd, 1959.

[4] Goon, A. M., Smoking & Lung Cancer. Now, Nov. 1968.

[5] Haenszel, W., Loveland, D. B., Sirken, M. G., Lung cancer mortality as related to residence and smoking histories. Journal of National Cancer Institute, Vol. 28, 1962.

[6] Preston, Samuel H., The age-incidence of death from smoking. Journal of the American Statistical Association, Sept. 1970.

[7] Sanghvi, L. D., Rao, K. C. M., Khanolkar, V. R., Smoking and Chewing of tobacco in relation to cancer of the upper alimentary tract. British Medical Journal, Vol. 1, 1955.

[8] Wynder, E. L., Bross, I. J., A study of elilogical factors in cancer of the esophagus. Cancer, Vol. 14, 1961.

[9] Smoking and Health : Report of the Advisory Committee to the Surgeon General of the Public Health Service, Govt. of U.S.A.

[10] Smoking and Health : Summary and Report of the Royal College of Physicians of London on Smoking in Relation to Cancer of the Lung and other diseases.

অনুক্রমণী

সুবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস

[সর্বশেষ যে বাংলা সূচীপত্রটি প্রকাশিত হয় সেটি শ্রীমতী চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় প্রস্তুত হয়। উক্ত সূচীপত্রটি ১৯৬৬ সালে শ্রীসুভাষ বসু কর্তৃক সম্পাদিত পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। গত বছরের হীরক জয়ন্তী সংখ্যায় এই ধরনেব অনুক্রমণী প্রকাশিত হলে নিঃসন্দেহে পত্রিকাটির যথেষ্ট গুণবৃদ্ধি হত। স্থানাভাব থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সংখ্যায় এই প্রকার মূল্যবান অনুক্রমণী প্রকাশেব ব্যবস্থা কবেছি। অনুক্রমণীতে সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন জাতীয় লেখা তালিকাভুক্ত করা হয়নি। —সম্পাদক]

লেখক/লেখিকার নাম	শিরোনাম	খণ্ড	পৃষ্ঠা
কর, শুভা	ক্যান্সার	৫২	৭৯
গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশিস	খরা ১৯৭২	৫০	১০
ঘটক, কমলকুমার	হিন্দু নবজাগরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র	৫০	২৩
ঐ	উনিশ শতকেব ধর্মচিন্তা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	৫১	১২
ঐ	হিন্দু নবজাগরণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী	৫২	৬৯
ঘোষ, তপোব্রত	শরৎচন্দ্র : ব্যক্তি সমাজের দ্বন্দ্ব	৫০	১৮
ঐ	"জংশন স্টেশনে" যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের একটি কবিতা	৫১	৩৩
ঐ	'পথের দেবতা'র উৎসসন্ধানে	৫২	২৯
ঘোষ, শঙ্খ	হাসপাতাল	৪৯	২৬
চক্রবর্তী, অরিন্দম	রাসেলীয় অপবর্গ : তার স্বরূপ ও সিদ্ধি	৪৯	২৪
ঐ	মৃগতৃষ্ণিকা ইত্যাদি	৫২	৩৯
চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ	তোমাকে এখন মনে পড়ছে	৪৭	৭
চক্রবর্তী, দীপেশ	মনে মনে	৪৭	১
চক্রবর্তী, সীমা	কোন একজনের স্মরণে	৪৭	৩
চক্রবর্তী, স্বপন	রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা : দুটি সূত্র	৫০	১২

দত্ত, গোপা	একটি কল্পনা ও একজন কবি	৫২	৬৪
দাস, বিশ্বনাথ	ধূমপান নাই বা করলেন !	৫২	৮৫
দে, জিষ্ণু	৪ঠা মার্চ, ১৯৮৯	৫০	৩০
দে, বিষ্ণু (অনুবাদ)	আজিয়েন হারুন ঃ নির্বাহ	৫০	৭
পাল, পলাশ বরণ	সভ্যতার ইতিহাস ঃ দুটি মৌল উপলব্ধির সূত্র	৫১	২৭
ঐ	প্রথম যুগের একজন ছোটগল্পকার	৫২	৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক	বিনে স্বদেশী ভাষা	৫১	৫
বন্দ্যোঃ, প্রশান্তশঙ্কর	দানিকেনের বক্তব্য—একটি সম্ভাব্য প্রকল্প	৫২	৭৪
বন্দ্যোপাধায়, শমীক	জনৈক ছাত্রের চোখে অধ্যাপক তারকনাথ সেন	৪৯	৯
বসু, জয়া	সাথী	৫১	৩৮
ভদ্র, গৌতম	রবীন্দ্র সাহিত্য ও বৌদ্ধ অবদান	৪৭	২৭
মজুমদার, অমিয়কুমার	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যেমন দেখেছি	৫২	৫৮
মজুমদার, চঞ্চলকুমার	বসু পরিসংখ্যান	৫১	২২
মজুমদার, নির্মলকান্তি	আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজ	৫১	১
মজুমদার, সুবোধকুমার	ওটেন সাহেবের কয়েকটি চিঠি	৫১	৪৯
ঐ	স্মৃতিতর্পণ	৫২	১৯
মিত্র, হরপ্রসাদ	নিহিত অভীপ্সা	৪৯	১৫
ঐ	শ্রুতি ঐশ্বরিক	৪৯	১৪
মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ	প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্র	৫২	১১
মুখোপাধ্যায়, মণিকুন্তলা	কবিতা	৪৯	১৭
ঐ	গর্বিত বিদায়	৫১	৪২
মুখোপাধ্যায়, হরিদাস	বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব	৫১	৪৪
রায়, জীবেন্দুকুমার	কফি হাউসে একঘন্টা	৪৭	৮
রায়, বার্ণিক	প্রাজ্ঞতা	৫০	২৯
রায়, সোমক	আমাকে কিংবা অনুরূপ অন্য কাউকে নিয়ে	৪৯	২০
রায়, স্বাতী	হাসনুহানা	৫২	২৪
রাহা, চিত্রভানু	ভেবেছিলাম—তুমি আসবে	৫২	৭৩
ষণ্নিগ্রহী, তুষারকান্তি	বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি	৫২	৪৮
সরকার, অমিতাভ	পলাতকের ট্র্যাজেডি	৪৭	৪
সান্যাল, কল্যাণ	ধনতন্ত্র, বিমুক্তিবোধ ও সমন্বয়	৪৯	২০
সাহা, অরুনোদয়	নায়ক, নায়িকা ও লেখক	৪৭	২৫
সেন, অভিজিৎ	জনতায় নির্জনতায়—জীবনানন্দ	৪৭	১৫
সেন, শংকরনাথ	হিতোপদেশের গল্পকার	৫২	৫৪
সেনগুপ্ত, গুঞ্জা	পরিক্রমান্তে	৫১	৪৩
ঐ	চলে যাব শৈশব শিকারে	৫২	৭২

পরিচিতি

অমিয়কুমার মজুমদার ॥

দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

অরিন্দম চক্রবর্তী ॥

দর্শন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র। তর্কের রসনায় তর্কাতীতে উত্তীর্ণ ; মৌর্যযুগীয় ব্রাহ্মণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাত্মের যৌক্তিকতা খুঁজে বিফলতায় উন্মার্গগামী।

কমলকুমার ঘটক ॥

পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ; ইতিহাসের অধ্যাপক।

গুঞ্জা সেনগুপ্ত ॥

ইতিহাসের প্রথম বর্ষ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী। নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য টিপটুকুই যথেষ্ট মনে করেন।

গোপা দত্ত ॥

স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ বাংলার ছাত্রী। প্রসাধনে গভীর অনীহা, যদিও জ্ঞান আহরণের প্রবল ঔৎসুক্য তার পরিপূরক।

চিত্রভানু রাহা ॥

দ্বিতীয় বর্ষ রসায়নের ছাত্র। বেশীর ভাগ সময়েই লাইব্রেরীতে এ্যাটলাস সদৃশ ঔদাসীন্য নিয়ে পৃথিবীর নানাবিধ সমস্যার সমাধান অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকেন। বাকী সময় কোলকাতাকে বৃন্দাবন ভ্রমে পরিভ্রমণ করেন।

তপোব্রত ঘোষ ॥

তৃতীয় বর্ষ (বিদায়ী) বাংলার ছাত্র। সর্বদাই ভয়চকিত দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে বিবিধ আবছা কোণে সঞ্চরণ করেন, অভিধান ইত্যাদি সশস্ত্র হয়ে।

তুষারকান্তি ষন্নিগ্রহী ॥

স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ (বিদায়ী) শারীরবিদ্যার ছাত্র। সদালাপী ভদ্রলোকটির গোঁফের ফাঁকে চিরন্তন হাসি, লেডিজ হোস্টেল প্রভৃতি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সংস্কারে ও চুলের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণে বিদ্যাসাগরসুলভ উৎসাহ। অবসর সময়ে পড়াশুনা করেন।

পলাশ বরণ পাল ॥

তৃতীয় বর্ষ (বিদায়ী) পদার্থবিদ্যার ছাত্র। একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ঐতিহাসিক গুরুত্বপ্রাপ্তির মূলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালীর বিদূষণ রীতির প্রতি দুর্বলতা। এহেন সদাশয়ের গণিতপ্রীতির একমাত্র ব্যাখ্যা চার্লস ডব্‌সন সাহেবের উদাহরণ, বিশেষতঃ এইবার যখন তিনি রূপকথা নিয়ে পড়েছেন।

প্রশান্ত শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

প্রথম বর্ষ দর্শনের ছাত্র। গণ্ডদেশের গভীরতা অপ্রকাশিত কবির মত; তাত্ত্বিক বিপ্লবীর দাড়ি নিয়ে দর্শন জগতে বিচরণ করেন।

বিশ্বনাথ দাস ॥

পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

শংকরনাথ সেন ॥

তৃতীয় বর্ষ (বিদায়ী) ইংরাজীর ছাত্র। বর্তমান সংখ্যার সম্পাদক। হাসিখুশি, শান্তশিষ্ট, ছোট্টখাট্ট সাহিত্যানুরাগী। সাবওয়েতে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজানো থেকে পাঁচ পয়সা সস্তায় কুঁজো কেনা পর্যন্ত সব ব্যাপারেই এঁর সুশ্রাব্য মতামত আছে।

শুভা কর ॥

বাংলা প্রথম বর্ষ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী। জীবন ব্যাপারটা এঁকে অহেতুক ভাবিয়ে তুলেছে। কথাবার্তায় (লেখার ব্যাপারে এখনো জানি না) ভাবী কথাশিল্পীর প্রতিশ্রুতি।

সুবোধকুমার মজুমদার ॥

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক। বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজে ইতিহাস পড়ান।

সুবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস ॥

কলা বিভাগের সহকারী গ্রন্থাগারিক।

সোমক রায় ॥

প্রথম বর্ষ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পদার্থবিদ্যার ছাত্র। সর্বদা সংজ্ঞাতীত এবং সংজ্ঞাহীন। কৈশোর উত্তীর্ণ হবার পর থেকেই ক্যান্টিনের স্থায়ী বাসিন্দা। কাজের সময়ে অহেতুক (কিংবা সহেতুক ?) গেছোদাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

স্বাতী রায় ॥

তৃতীয় বর্ষ অর্থনীতির ছাত্রী।

The Inaudible Voice of Black Orpheus

GAUTAM BASU

While poetry has never been a substitute for living, it can at least claim to have bestowed a rare eloquence on life. It promises to survive the drawing room, the twentieth century and even its brain-child, the best-seller, but will it ever survive its own mainstream ? The emerging poetic thought, though under severe strain, is passing from fashion into style. But what of the meritorious yet inaudible voice, the voice of the negro, for example ? The Dark Continent is proving an ironical nickname, no doubt.

As the main inhabitant of a richly endowed but largely devastated continent, the negro* still stands by his inexhaustible pride as faithfully as he acknowledges the shame of his predicament. If awareness has been his attainment, innocence has surely been the pearl of great price. Chaining the body and unchaining the mind was a rather self-defeating act on the part of the West, but chains can be different. While France dazzled her colonies with her culture, the British administration held back the relation at a relatively mundane level. Consequent to the so-called policy of assimilation, the negro in the French colonies realized that France was willing to lend her poets but only if he was willing to drop his black identity. Pride did not allow this absorption. Hence, awareness on the second lap, marked 'a return to my native land'. The negro accepted the West culturally, but not in isolation ; what flowed out of him thereafter was in his own idiom. This two-way process, one of assertion, the other of rejection, is termed 'ne'gritude'. The coinage of the word is credited to the West Indian poet and dramatist Aime'Ce'saire, who together with Leopold Senghor and Leon Damas were the main propagators of the idea.

The cultural effect of British colonization lacked this complicated character. In the absence of spoon-feeding the negro here was more spontaneous about integration. Poets like Wole Soyinka now go so far as to ridicule the idea of ne'gritude by wondering whether a tiger has any reason to proclaim his tigritude. This seems a trifle unrealistic ; because of the diametrically opposite natures of the cultures there is bound to be at least an element of ne'gritude in contemporary black literature. After all, there is always a feeling of bewilderment in finding oneself in between two immense worlds. "And I lost in the morning mist / of an age, at a riverside keep / wondering in the mystic rhythm / of jungle drums and the concerto" [Gabriel Okara (1921—), Nigeria, *Piano and Drums*].

Portuguese colonization, largely limited to the bayonet, acted on a very different plane. The South African re'gime probably goes far deeper, but in both cases the negro reacts sometimes in despair and very often in anger, but always with the tropical sun to set fire to his anguish. The West Indian is still searching for his roots : "Have I got not an ancestor / from Mandingo, the Congo, Dahomey ?" [Nicolas Guille'n, Cuba, *The Name*]. Only Ce'saire has found his, it lies within him. However geography may intrude, one point is quite clear : the fact that Black Orpheus has sung at all, is not because of, but in spite of his shackles.

The entire volume of poetry under consideration here was written in English,

---

* Radically, negro constitutes only a part of black Africa. The term here is used only because of convenience.

French or Portuguese. Could it mean that the 'return' is illusory ? This doubt is not as damaging as it seems, it only points to a discrepancy which arises not not so much from a cultural problem as a technical one. Vernacular poetry has not dropped off, it is only that the compilation and translation of works pouring out of a mosaic of small states is basically a slow process. Some headway has been made especially in Zulu poetry and one expects that the pace will improve. Given these limitations, one is expected to approach African poetry with the consciousness of a partial access. It is quite fortunate that even this has been possible. Senghor's pioneer attempt of *Anthologie de la nouvelle poe'sie negre et malagache* has stimulated a host of periodicals like *Presence Africaine, Encounter, Transition, Okyeame* and above all, *Black Orpheus.* To this day, they remain the only mouthpieces. Actually, the entire picture is particularly depressing : the negro writing in a foreign language is lent a condescending ear ; the negro writing in his mother tongue is left out in the cold.

As an estranged counterpart of the African negro, adjustment for the black American has been just as painful. English (or rather 'Black English' as some of them now insist) has become his mother tongue and through it, he remembers in pain : "My eyes grew dim and I could no more gaze ; / Aware of the longing through my body swept, / And hungry for the old familiar ways, / I turned aside and bowed my head and wept" [Claude McKay (1890-1948), *The Tropics in New York*]. Besides nostalgia, the comparatively older segment of black American literature is marked by a strong accent on a privately perceived religion. While it is true that the negro winced at almost everything the white man dealt out to him, it is also true that, on the whole, he was spontaneous about Christianity. For centuries this new religion had gripped the Western imagination and now it totally consumed the negro. Driven to an alien land to serve an alien people, the negro had only his faith about him and religion set it to music. For quite sometime the influence had an oblique effect—the negro turned his heart to the river of Jordan and allowed the Zambesi to quieten inside him. In time, he has readjusted his co-ordinates and accepted America as his home, a painful place to live in—but home, nevertheless. As for Africa, it is a haven. Adjustment for him has meant the acceptance of a new code, and what is more, a wider perspective. The latter may emerge from a poem on Gandhi : "Now they have taken your death to their rooms/And here in this far city a false spring / flounders in the ruins of your quiet flesh / And deep in your marvellous wounds / The Sun burns down / And the seas return to their imagined homes" [Myron O'Higgins (1918—), *Vaticide : For M. K. Gandhi*].

Judging from this, one would believe that there is a general distrust for closeted poetry, unless as Le Roi Jones suggests, 'the closet be as wide as God's eye'. And yet, one must admit that in spite of the heritage of the negro spiritual, that oral tradition and the growing maturity stemming from e. e. cummings and Gwendolyn Brooks, black American poetry on the whole—barring the inevitable exceptions—lacks true quality. This could be partly due to the fact that this volume is much too cluttered with 'poems that kill' (or at least intend to do so) and lines seemingly ferocious ('guess i'll keep my razor and buy me some more bullets').

A surprising exception is the female voice ; drawing profusely from Gwendolyn Brooks, poetesses like June Jordan and Nikki Giovanni, both of whom once followed the militant, are now trying to establish an entirely different track : "they'll probably / talk about my hard/Childhood and never understand that all the while I was / quite happy" [Nikki Giovanni, *Nikki-Rosa*]. Another reason behind the failure (and here not even poetesses are above reproach) is Americanism itself, which at its lowest ebb ranges from Ginsbergish emptiness ('I want to be known as the man... who overthrew the CIA with silent thought') to a manhunt for a tradition that never was. But perhaps one is being too harsh ; there is no doubt that supported by his personal vision of Africa, the black American at his introspective best, can be a highly eloquent person. His vision of Africa as a haven is ill-fitting in his mercurous surroundings and so it raises itself to a dream : "But each night when the city shrinks,/the stars roof us, / And any bush becomes our Bantu wonderland" [Eugene Redmond (1938—   ), *Definition of Nature*]. But not all Africa is a dream, also present is the Biafran tragedy where the white hand was clean and instead black fought black. The effect of this on the American is difficult to assess, perhaps he is glorifying dissent ; or perhaps he is dismayed at the lack of unity he always took for granted : "Biafra. O mother, hear the growl the night is cold, cold, cold" [L. V. Mack (1947—   ), *Biafra*].

II

The success or failure of technique is rather difficult to assess because it involves a subtle mixture of both foreign and domestic schools. The traditional African form is based on music, which in turn rests on the negro's genius for rhythm. This is obvious for anyone who has even a casual ear for the negro spiritual or the West Indian callypso. A simple line like "My Lord ! What a mornin", or "Buy me mango" can attain a dimension which has to be heard to be believed. But here one must confine oneself to the implicit nature of the music, a music that comes through, even if the poems are not sung. And this is where the problem arises, lines like "I have my gri-gri/gri-gri/gri-gri/my calm bounding awake" [Antoine-Roger Bolamba, Congo (Kinshasa), *Portrait*] would be totally incomprehensible to the reader, yet entirely communicative to the listener. In such an instance where sound itself generates and often transcends meaning, appreciation can be difficult. The only solution would be to cultivate the musical ear and match it with recitation. But this is essentially a long-run affair and what is more, genuine folk music is well on its way to extinction. Very fortunately sometimes, sound lines can beat barriers and set even the deafest of musical ears ringing. When words can no more convey the throbbing of blood, music does : "Piqui-tiqui pan, Piqui-tiqui pan !" And not only this, any musical image can appear : "the rumba now fades with con-con-co-mabo' ! / And pa-ca, pa-ca, pa-ca, pa-ca ! / Pam ! Pam ! Pam !" [Jose' Tallet, West Indies, *Rumba*]. It would not be illogical to claim that here the negro is ahead of many of his contemporaries—which peculiarly enough implies a throwback in time. After centuries of divorce, poetry returns to music.

A second aspect of the African form also stems from the oral tradition but here the associations are different. Occasionally, this technique is used in lament for the receding old world. In the following lines one can surely picture a distraught housewife : "Listen my clansmen, / I cry over my husband / Whose head is lost. / Ocol has lost his head in a forest of books" [Okot p' Bitek (1931—), Uganda, *Song of Lawino*]. It is a delight to read this kind of poetry.

Western influence brings in associations from another world, it dates back only to Andre Breton, French surrealism and Ce'saire. The impact of Ce'saire has been enormous, and that explains why (in spite of the geographical separation) he retains an unshakable prestige. And yet, a few questions remain. Did Africa accept Ce'saire *because* of his surrealism ? Would not the same thought under any other powerful garb been as infuential ? If these questions can be answered, they may well lead to the contention that the influence of surrealism was no more than incidental. Actually, Ce'saire appeals differently to different audiences, in Europe, he is a surrealist mastermind, in Africa, he is an eye-opener who works more consciously than conventional surrealism can accommodate. In fact, the tradition from the 1920s that the negro has set up for himself is a 'little tradition' as opposed to a 'great tradition', and this a tradition replete with disarming simplicity : "You must be from my country / I see it by the tick / of your soul around the eyelashes / and besides you dance when you are sad / You must be from my country" [Tchicaya U Tam'si (1931—), Congo (Brazaville), *Epitome*].

Not always, however, has the final form been as original in effect, or as powerful. Coming to the British influence, one occasionally notices an uneasy attempt at Hopkinsian craftsmanship— "drop of dew on green bowl fostered / on leaf-green bowl grows under the lamp / without flesh or colour" [Christopher Okigobo (1932—), Nigeria, *Transition*]. Cultural import has, necessarily, to stop at a certain level because below it new words only become echoes of old ones. This is true even if one goes beyond technique ; the borrowing of ideas can fail to produce effect because of a basic difference in situation Trapped in circumstance, the white man declared that he could know 'only a heap of broken images' whereas the negro did not face this urban crisis at all. He could still extract a positive meaning from his images : "an image insists from the flag-pole of the heart, / the image distracts / with cruelty of the rose" [Christopher Okigobo, *Limits*]. In this restricted sense the negro does not cater to Eliotesque ideas, if a fragment in him has sought God, it has been by way of complaint against discrimination—not because he has found life meaningless. The few instances where Eliot's philosophical influence appears directly, probably mark a lack of understanding The lines : "The past / is but the cinders / of the present ; / The future / the smoke that escaped / Into the cloth-bound sky" [Kwesi Brew (1928—), Ghana, *The Search*], indicate a confusion regarding Eliot's watered down version of the Hindu concept of circular time. Even if a claim to originality seeks to by-pass Eliot, the question of the adequacy of such an image remains.

Contemporary poetry, on the whole, does not fully subscribe to any of these extremes, traditional or European, but has evolved an independent line. And here, Eliot certainly has an audience in that poetry strictly maintains a link with common speech. Of course, it is true that there was no considerable divergence in the past—but that certainly does not guarantee immunity. At its best, the independent line can, without being over-decorative, lend a sparkle to the most hackneyed of pictorial scenes : "This is a silence / all of flowers / Suddenly jumping to the futile pawings of a breeze" [Fred Johnson (1940—), USA, *Arabesque*]. This candid expression can tackle most situations ; when asked to convey one's national pride, one either tends to withdraw into much too personal imagery or strike up hue and cry for the motherland. In contrast, the negro simply says : "My race / remembers / the taste of bronze drunk hot" [Tchicaya U Tam'si, *Brush-Fire*]. There is no reason to believe that there already is any full-scale medium or that the quality is homogeneous, but there is the possibility of black poetry moving into a poetically stagnating Europe while it helps and is helped by African poetry in the vernacular.

III

Two of the notable features that work silently in the subconscious are, firstly, a special fascination for the tropical sun, and secondly, a hyper-sensitive craving for the night. In spite of this apparent inconsistency there seems to be a rationale behind the attitude. Darkness is imagined to be a grand manifestation of the colour of the skin while the sun is more than a life-long companion—it is an item without which any image of the expanse of Africa would only be halfcomplete. For instance, only a negro can write the lines : "The Sun hung by a thread / In the depths of Calabash dyed indigo / Boils the great Pot of Day. / Fearful of the approach of the Daughters of fire / The shadow squats at the feet of the faithful" [Biago Diop (1906—), Senegal, *Diptych*].

But can one really conceive of light ? The poet does not claim success, instead, he holds close rare moments, moments when "you have slumped down / A natal slump, there shed / Distended in the dust—No ! / As a primeval shadow / tumbling head over heels into arms of light" [John Pepper Clark (1935—), Nigeria, *A Child Asleep*]. A violent reaction against light occurs only when the focus is on objects and situations, the negro does not want to be reminded of : "I shall see no more of this sun that totters, / this light which crumples under the slow shadows" [Emile Ologoudou (1985—), Dahomey, *Vespers*]. Barring such exceptions, the negro, mostly, is enthusiastic about nature—probably because, the moment he turns away, he is confronted by too much of ugliness. He is certainly not an escapist, if only because of the white man's negative Utopia not having offered him the luxury. It is only that that he is fond of a frequent return to beauty and, perhaps, sensibility. But such a withdrawal is necessarily short lived ; the moment he is conscious of himself, all the pain comes flowing back : "Our grass is rich here / my first coming / was the harsh explosion of a lint / solitude / my mother promised me to light" [Tchicaya U Tam'si (1931—), Congo (Brazaville), *Dance to the Amulets*].

The nocturnal theme, on the other hand, employs different means to achieve quite the same silent power. Very often, however, it tends to become self-conscious. Somehow, one is reminded of the literary effects of Milton's blindness. Many stalwarts have split hairs over the issue, but one point, can perhaps, still be made. The anti-Miltonians never knew what it *is* to be blind and the over-critical white critic can never really expect to know what it *is* to be black. Of course, one can always cite the case of Beethoven, but then, there was only *one* Beethoven. Actually, the weakness lies elsewhere. Throughout a particular work, the poet may be conscious of a self-constructed relationship with darkness, but because of a lack of sustained ability, only a line or two bounces off the page. For instance, in a poem like "For Bill Hawkins : A Black Militant" one can easily skim down the lines totally unmoved, until one is hit squarely in the face by the line : "Night, let me be a part of you, / But in my own dark way" [William J. Harris, USA]. And this too, after a time, seems over-sentimental.

When the theme of darkness is a success, it is a flying success. By carefully integrating separate entities (and echoing of 'objective correlative') the negro can point a brooding landscape which is more than a sum of its parts—it lives again : "The moonlight : / Juice flowing from an over-ripe pomegranate / bursting / The cossack-crested palm trees/motionless/The leopard spotted shade/inciting fear/

silence seeps down..." [Lewis Alexander (1900—45), USA, *Enchantment Part I: Night*].

In retrospect, one tends to think that these recurring images mark the ground where the poet is still dealing with a private theme, but gradually tending to move towards a public one. More often, the two lines are indistinguishable : "Night, you rained / Serrated shadows through dank leaves / Till bathed in warm suffusion of your drappled cells / Sensations pained me, faceless, silent as night thieves. / Hide me now, when the night children haunt the earth. / I must hear none." [Wole Soyinka (1935—), Nigeria, *Night*]. Such power can arise from a poem because there is no conscious attempt at lyricism. Lyricism is certainly not an end in itself, it is like paint and paint is only the expression of colour. Even when he is 'anti-lyrical', the negro writes in a style : "harbour lights glaze over restless docks, / police cars cockroach through the tunnel streets ; / from the shanties' creaking iron sheets / violence like a bug-infested rag is tossed." In spite of this sordidness, the poet draws out strands of peace : "but for this breathing night at least / my land, my love, sleep well" [Dennis Brutus, South Africa, *Nightsong : City*]. The belief that all this discord is solely the product of racism is an over-simplification. However evil racism might be, it is just another experience and poetry leads it to a perception : "I always have / Come some way closer to knowing / the final sequence of song that's going / to master the solitudes night can teach" [K. A. Nortje (1942—), South Africa, *Up Late*]. These are lines anybody can be proud of because they herald an era when the negro will move out of his skin and consider himself to be a black *human being* instead of a *black* human being. This is an era long over-due and one which would have normally taken over, but for a few centuries of insult : "he came to deliver the secret of the sun / and wanted to write the poem of his life / why crystals in his blood / why globules in his laughter / his soul was ready / when someone called him dirty wog" [Tchicaya U Tam'si, *A Mat To Weave*]. And so, 'black became a burden bravely chanted' and bitterness, a voice that will keep on hammering till that 'someone' takes back the insult. Ultimately, one expects, the negro, black as ever, will proudly stride into a grand participation he now sees only in fishermen who "sit round dim lights with Babalawo / throwing their souls in four cowries on sand trying to see tomorrow" [G. Okara, *One Night at The Victoria Beach*].

IV

The negro does see the world from his corner but he is not preoccupied with it, he too is conscious of a colourless decay which is bound to all birth : "And my memory / present and future tickles / the womb like the pulse / of this naked air / in the eye of a tear drop. The dead cannot / remember even the memory / of death's laughter" [William Kgositsile (1938—), South Africa, *The Air I Hear*].

The negro here, in all his ignorance, is brave enough to tone himself down to an embarrassing humility : "He knew only / sudden seizure. And time conquest / bound him helpless to each grey essence" [Wole Soyinka, Nigeria, *Prisoner*]. This acknowledgment of nature fits, very interestingly, into his poetic philosophy. To put it very crudely, black poetry has three main facets to it—the white man, the black man and nature, none of which is exclusive of each other. This characterized split implies a partial approach, and is, therefore, incomplete—but then, so are all poetic philosophies. It is both natural and artificial—natural, because it is the logical outcome of circumstances, and artificial, because it reflects man's warped sense of domination. Subject to time, the present conflict between man and man expressed in racial terms may disappear and with it the main relevance of current black philosophy. But, almost certainly, new conflicts will arise.

But why has the negro failed to gather an audience ? One could tend to apprehend an unwise neglect. But perhaps, neglect is a necessary coccoon ; very often there are silent battles to be fought. On a broader plane, the real difficulty for poetry is that it now thrives in an age of prose. And this leads to a deeper problem : even literature, on the whole, is not doing very well compared to, say, technology. The novel is trying to seduce Hollywood ; avant-garde theatre is echoing uncomfortably in empty halls ; poetry with wings clipped, is lonely as never before. Against this general decline in appreciation, literature has scored only one victory—the rise of the parallel cinema. Yet, poetry has a blessing in disguise, because there is no money in it, it will manage to survive imperceptibly while travelling from hand to hand in expectancy of another Ezra Pound. Meanwhile, as the negro says, the spider soul will keep on "spinning / spinning / spinning endlessly" in the hope that some day there will be a web.

REFERENCES

All the poems quoted above have been taken from anthologies, *Modern Poetry from Africa* edited by Gerald Moore and Ulli Beier, published by Penguin (1973 edition) and *The Poetry of Black America : An Anthology of the Twentieth Century* edited by Arnold Adoff, published by Harper and Row, New York, in 1973. The works of cummings, Hughes, Brooks, Senghor, Ce´saire and others have not been discussed because in spite of being black, they do not constitute the inaudible voice. For a fuller understanding of black social and individual psychology the reader is referred to all the works of Fanon and especially to *The Fire Next Time* by James Baldwin (Penguin). In poetry, the fullest representation is found in Ce´saire's *Cahier d'un retour au pays natal*, translated by John Berger and Anna Bostock under the title *Return to My Native Land*, (Penguin, 1969).

The Need to Promote Forestry in India

Pradip Kumar Sanyal

Forests are indeed one of nature's most wonderful gifts. Besides contributing immensely in various direct and indirect ways to our sustenance, our growth and our development it also helps to maintain the natural equilibrium all around, without which we could not have survived. It has been rightly pointed out : "The forest is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence that makes us demand for its sustenance, and extends generously the product of its life activity, and it affords protection to all beings even to the axe-man, who destroys it."

The need to attend to the forest and its proper management need not be over-emphasized. Mr. Nehru once said, "In the economy of nature, forests are of utmost importance." It was with this idea that the National Forest Policy of 1952 was evolved, which envisaged for the extension of forests in India.

However, the process of shrinking of the forest area under increasing pressure of human and cattle population started long ago and has continued ever since. Only the degree of tempo of the demand for exclusion of forest lands for cultivation and other purposes, and regulations of the restrictions placed thereupon has varied from time to time. On account of population explosion, demand for agricultural land, expanding industries, space for dwellings and mines, forest area to-day is shrinking at an increasing rate. And this is heaving its inevitable adverse effect upon the entire population.

Under-utilization of resources is one of the major characteristics of an under-developed economy. Although we have now gone considerably ahead in the industrial and production sector and have claimed our rightful place amongst the developing nations, we are yet to make the best use of such natural resources as the forest wealth. Intensive work in this particular field is in progress at present.

Lack of extensive activities, apathy of general public and politicians has all along led to the gradual depletion in the over-all forest area as against the splendid idea of National Forest Policy of 1952 to bring 33.3% area of the country under forest cover. Going through the statistics of 1969-71 one observes that only 22.9% of total land area of India is covered with forest which is considerably less than in many developed countries such as U.S.A., U.S.S.R and Japan. Owing to the large population of India, per capita forest area is naturally very low.

Country	Per cent under forest (as on April, 1971)
India	22.9%
U.S.A.	31.62%
U.S.S.R.	50.62%

For variety of reasons the forest remains vitally important to us. It helps to maintain the environmental conservation ; reduces the hazards of polution besides providing the domestic and industrial needs of log, timber and plants and seeds used in pharmacy and perfumery. Forest helps in the conservation of water resources, conservation of soil for better crop production by keeping its fertility. It also helps to mitigate floods by reducing soil erosion on hill tops and river-sides. Sedimentation of the lakes, dams, canals and rivers, can also be checked to a considerable extent through forestry. Tree land remains very effective yet cheap means of moderating the extremes of climate and mitigating its rigours. Forest not only forms the basis of our industrial development, but also of export and import and agricultural advancement, because tree land helps to bring the rains, protects the fertile top soil in nutriments and regulates water points for development of fodder, maintenance of cattle wealth, development of fisheries, and watering the fields in the ban periods of scanty fall. Forest also helps to maintain the balance in the sub-soil water level.

Hence, while making large scale exploitation of forest resources to meet the rising needs, it is also important for us to undertake adequate compensatory plantation and regeneration operation. It has been statistically found out that even if each of us in India plant one tree each, we can then produce some million cubic feet of timber. Thus, the solution is not difficult to solve, but which is certainly difficult to arouse the public consciousness to this problem. A day's '*Vana Mohatsava*' is certainly not enough. Sustained and sincere effort by all and throughout the year is required to solve this problem.

Soil erosion still remains one of the major causes of the disastrous floods that are so frequent in India. The Government as far back as in 1952, through its National Forest Policy declared that the forest should cover 33.3% of over-all land area, with 60% in hilly regions susceptible to soil erosion and 20% in the plains. The subject has continued to attract attention ever since. 'Contour bund', 'Contour trenching', and 'Check dams' has been evolved in hill slopes in order to conserve surface soil and reduce erosion. Forest has been classified into land capability classes, and those that are to be kept for pasture, for horticulture and for permanent forestry has been clearly specified. 'Shelter belts' and wind braker have been introduced to check wind erosion in plain lands. 'Rim bunds' have been used to minimise erosion of riversides. Such scientific approaches are helping to minimise the problems, but much remains yet undone.

The perceptible effect of forests on agriculture has not been found out as yet. It has been observed that agricultural land within the forest blocks do not suffer from drought and flood.

Nevertheless, the best prospective side of forestry, at least in India, is its role to mitigate the domestic energy crisis. Estimates have shown that 30% of total energy could have been better utilised as manure in the agricultural fields. The availability of fossil fuels like coal, mineral oil, nuclear fuels are limited, and their stock will necessarily be exhausted sooner or later. But fuel wood is a renewable source of energy and if developed and managed can meet the major part of the domestic needs. At the same time burning fuel wood unlike fossil fuel will not interfere with carbon dioxide balance in the atmosphere, nor will it alter the heat balance of earth, because while fuel wood during burning release the energy collected in the recent past, fossil fuel release during its burning solar energy collected millions of years ago, thereby altering the present temperature balance of earth. Fuel wood neither produces any hazardous and troublesome by-products. Unlike in the mining of fossil fuels which leaves behind unsightly scars in the landscape and destroys the ecological balance and causes soil erosion. Growing trees for fuel wood, far from any potential danger, provides sustained supply of pure air, clean water, besides minimising the soil erosion. It also provides the green foliage, so essential for building up a healthy and aesthetic environment. Last but not least, forest is the abode of the wild denizens of the forest. Preservation of wild life must necessarily therefore go hand in hand with preservation of forest. It is heartening to note that they are receiving increasing attention from the official quarters now. However, mere governmental or official initiative is not enough. People at large must develop a constructive attitude and help to promote the growth of forest in their own interest. They should conjointly learn to feel the truth of the statement : 'Wood is good, but tree is better'.

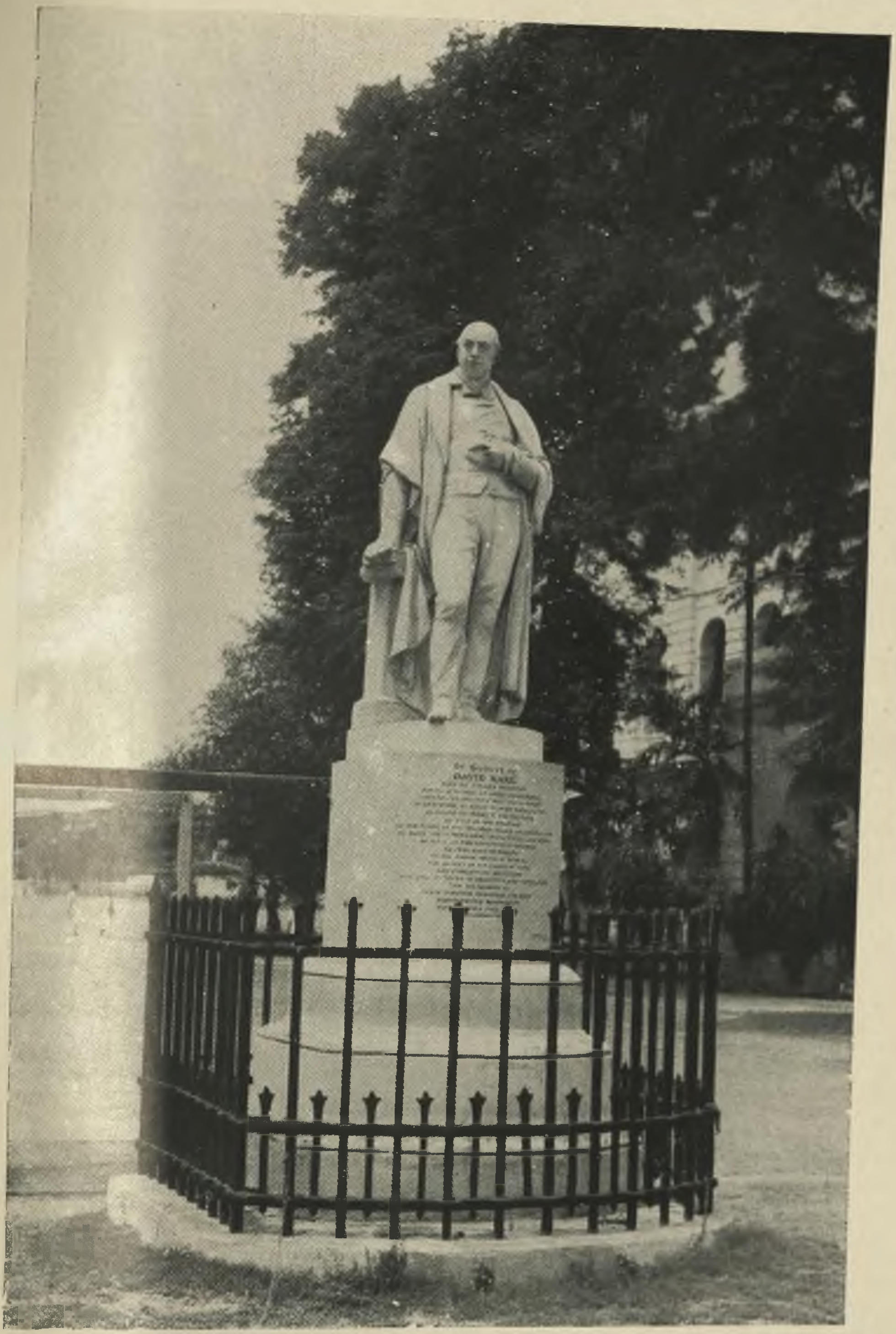

"Untouched and sacred be thy shrine..."

On Mathematics and Mathematicians

Gautam Bose

Then one of them spoke, "To me it reprensents a fossilised structure with mostly abstract principles which are drier than dust." To the mathematician, however, mathematics is like an evergreen valley where new things are continually taking place. Abstractness is its chief glory. No one has ever seen a perfect circle. Yet this ideal circle is used not only in school geometry but also in drawings of supersonic aircrafts. The nature of Nature is too complex to be put in mere words. By abstracting (and thereby simplifying), mathematics helps us unveil and probe deeper into Nature.

Though there have been eccentrics among mathematicians like Archimedes of Syracuse (287—212 B.C.), their number is not higher than the corresponding figures in other professions. Most of them were happily married and brought up their children in civilized and intelligent way. Some of them led interesting lives as lawyers, soldiers, diplomats, mystics, drunkards, professors and disappointed lovers.

How mathematics began is not exactly known. It came down in two broad streams : arithmetic and algebra as one, and geometry as the other. In the seventeenth century they united to form the ever-widening realm of mathematical analysis. The history of mathematics may be roughly divided into three periods the first period reaches upto A.D. 1637, the middle period spans from 1638 to 1800, and the final phase begins from 1801 and may by extended to the present date. The first period belonged to Babylon and Greece for the development of metric geometry (which is same as school geometry) and trigonometry, and to a lesser extent the age also belongs to India, for evolving arithmetic and algebra empirically. The Chinese and the Muslim, in particular, adapted the Indian techniques and carried them forward. The Greek, however, were the first to realize the necessity of rigorous proof in mathematics. Aryabhatta summed arithmetic progressions, solved determinate quadratics with one unknown and indeterminate linear equations with two unknowns and used continued fractions. Bhaskar (A.D. twelvth century) gave a method of deducing new sets of solution of $Cx^2+1=y^2$ from one set found by trial, C being a non-square integer and $xy \neq 0$—the so-called Pellian equation. Some of our modern analysis had to elaborate on this equation. Bhaskar's work is widely acknowledged as the finest achievement in the theory of numbers before Lagrange's in the eighteenth century. Brahmagupta (early seventh century) and Mahabir (ninth century) were similar stalwarts. In 1637 Descartes, masterpiece *analytic geometry* showed for the first time that algebra could be used for solving geometrical problems. This was later known as co-ordinate geometry, or Cartesian geometry. This method created a tidal wave in the world of mathematics. Rene Descartes (1596—1650) a French gentleman, a soldier, and at the same time a mathematician, was tutor to Princess Elizabeth, daughter of Frederic, King of Bohemia, and a grand-daughter of James I of England, then exiled to Holland, from 1641 to 1645. Their relations were not exactly what they ought to have been. He tutored another royal figure, a masculine young woman of nineteen, Queen Christine of Sweden, from 1646 to 1648. It is said that this lady over-worked the frail Descartes to death.

Two of Descartes' countrymen and contemporaries, Blaise Pascal (1623—1662) a literary and mathematical genious and Pierre Fermat (1601—1665), the greatest mathematician of the seventeeth century must be singled out from the motley crowd of contemporary mathematicians. Pascal, best known for his *Provincial Letters*, masterpiece in French literature, was a subject for Freudians. He gnashed his teeth at the sight of his married sister playing with her child. At first he led a severely disciplined life, then kept mistresses and indulged in immoderate drinking and finally became a mystic. In between he found time to write his *Provincial Letters* and practise mathematics of the first rate. Fermat, on the other hand, was a successful lawyer, urbane and humane. Mathematics was his hobby. Cultivating this branch of knowledge to fill his vacant hours, he carved out for himself a place in the forefront of mathematics. He had the essential ideas of calculus, found the analytic geometry independently, developed the theory of mathematical probability along with Pascal and did some work on the theory of numbers.

About half a century after 1637, came the calculus of Newton and Leibniz, one of the finest creations of the human mind. Isaac Newton (1642-1727), an Englishman, was by far the most prolific contributor to science ; he was as human as anybody else. While preparing for Cambridge in 1661, Newton lodged with a certain Mr Clarke, the village chemist of Woolsthorpe. There he fell in love with Clarke's step-daughter Miss Storey and became engaged before leaving. But pre-occupation with his work caused an intolerable delay so that Miss Storey lost her patience and became Mrs Vincent. Newton loved her all *her* life and never married. His account books also record several sessions of boozing and gambling.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), a German, was a universalist which Newton was not. Besides his brilliance in mathematics, his contributions to law, religion, statecraft, history, literature, logic, metaphysics and speculative philosophy was enough to make his fame and preserve his name. But he was greedy. Though a master diplomat, he served rich people throughout his life for money, so that when he died, not a tear was shed, not a gun boomed and not a rose adorned his grave.

The corner-stones of calculus, *differentiation* and *integration*. were known as far back as the third century B. C. Archimedes and Galileo are said to have used them for solving isolated problems. It was left for the genius of Newton and Leibniz, independent of each other, to discover the vital link—that differentiation and integration were really inverse operations. However, the notations of calculus are all Leibniz's. They are more convenient than that of Newton's.

The eighteenth century was devoted mainly to applications of the powerful methods of Descartes, Newton and Leibniz. Although these methods were not fully exploited till the twentieth century, Lagrange's work on algebraic equations, and particularly, in analytic mechanics have remained indispensable tools in physics to this day.

The Frenchman, Joseph Louis Lagrange (1736-1813) was a favourite of Napolean Bonaparte and Marie Antoinette and later became the idol of the people who put her to death. He married twice but had no children. His second marriage at fifty-six with a girl in her high teens who was actually daughter of his friend Lemonnier, the astronomer, proved to be ideal. The young maid was touched by Lagrange's loneliness and did her best to revive his lust for life. Soon Lagrange was madly in love with his young wife and could not bear to leave her alone even for a moment. He felt awfully miserable when she went shopping. He even accompanied her to balls where he would have never gone alone.

The third phase of mathematics, that is from the beginning of the nineteenth century till to-day, marks an era of unprecedented inventiveness, starting with the publication of Gauss's masterpiece *Disquisitiones Arithmeticae* in September, 1801. Carl Friedrich Gauss (1777-1855), was by birth a German, the son of a man who spent his life as a gardener, canal tender and bricklayer, is a stalwart among mathematicians.

It was only by a series of happy accidents that Gauss who is unsurpassed in mathematics in his precocity as a child, was saved from following one of the family trades. Dorothea Benz Gauss, his mother took her boy's part and defeated her obstinate husband in his campaign to keep his son as ignorant as himself. She expected great things of her son. When Gauss was nineteen, she asked his mathematical friend, Wolfgang Bolyai, whether Gauss would ever amount to anything When Bolyai exclaimed, 'The greatest mathematician in Europe !', she burst into tears. For the last four years of her life, she was blind and Gauss himself nursed her throughout this last long illness. Gauss received his doctor's degree in 1799, from the University of Helmstedt, Germany, for proving for the first time that every rational integral function of one variable can be resolved into real factors of the first or second degree which is to-day known as the *Fundamental Theorem of Algebra.* Higher algebra is flowering at such a breakneck pace that very soon mathematicians may have to hibernate due to paper crisis. The chart below shows its ramification.

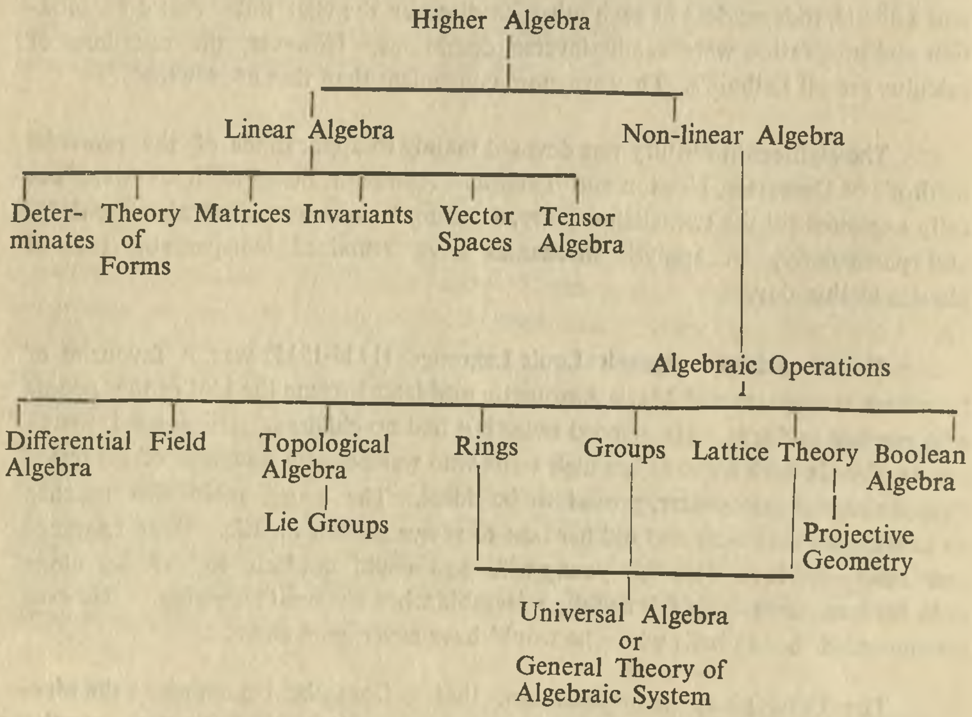
Higher Algebra
Linear Algebra
Non-linear Algebra
Deter-minates
Theory of Forms
Matrices
Invariants
Vector Spaces
Tensor Algebra
Algebraic Operations
Differential Algebra
Field
Topological Algebra
Lie Groups
Rings
Groups
Lattice Theory
Boolean Algebra
Projective Geometry
Universal Algebra or General Theory of Algebraic System

In geometry the 2200 year old stranglehold of Euclid (330-275 B.C.) was shaken off by the Russian geometer, Nikolai Ivanovich Lobachevsky (1793-1856), when he brought down Euclid's fifth postulate on parallel lines. Non-Euclidean geometry thus came into existence. Janos Bolyai (1802-1860) of Hungary, greatly extended Lobachevsky's work, (especially on Hyperbolic Geometry). Apart from Lobachevsky and Bolyai, there were other geometers who worked in this field, J. Plucker (1801-68) was a German who worked on four-dimensional geometry. Another German geometer, G.F. Bernhard Riemann (1826-66) studied Topology and Elliptic geometry, which is popularly known as Riemannian geometry. The Norwegian, •M.S.Lie (1842-99) popularised a portion of geometry which mathematicians reckon as Lie groups. The twentieth century has given birth to non-Riemannian geometry.

Among the most prolific creators of first rate mathematics, mention must be made of Austin Louis Cauchy (1789-1857), a Frenchman well-known for his 789 original papers, a Swiss, Leonhard Euler (1707-83) and Henri Poincare' (1854-1912), a Frenchman. The German, George Cantor (1854-1918), stands out for his brilliant creation of the *arithmetics of infinity*.

Pierre Simonde Laplace, a French mathematician, was a friend of Cauchy's father and their neighbour, dropped in one day. He was impressed to see young Cauchy, too feeble physically to be playing about. He was born on August 29, 1789, six weeks after the fall of the Bastille, was drowned in his books and papers and appeared to enjoy it. Within a few years Laplace was listening apprehensively to Cauchy's lectures on infinite series, fearing that this new discovery might send some of his hardest labour down the drain.

Euler and Poincare' had extremely weak eye-sight and both performed most of their calculations mentally. Euler was very fond of children : he had thirteen of his own, all but five of whom died very young. He often composed his greatest works playing with a child on his lap, while the elder children played about him. Poincare' could not see the blackboard or take down notes as a student. He would therefore sit at the back of the class, listening intently and that would be more than enough. Anything heard carefully or read once, became his permanent possession. Once, in his later life, he put up such a miserable performance in an I.Q. test that it would have been impossible to distinguish him from an under-developed child, if he had not been the greatest populariser of science then.

Strange things happen in the world of infinity. A part may be equal to a whole. For example, the number of all even numbers is equal to the number of all numbers, both odd and even. To see this, all you have to do is pair the two sets as shown

shown	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(2)	(4)	(6)	(8)	(10)

and continue for ever and ever without exhausting any one of the two sets. Hence, we come to the conclusion. So revolutionary was the creation of this branch of mathematics that before Cantor's time any one discussing such questions was considered stupid or psychopathic.

Srinivas Ramanujan (1817-1920) had a poor physique, a miserable academic record and worked as a post-office clerk for seven years of his life, is recognised as one of the greatest algorists and specialists in the Number Theory.

Today every branch of knowledge ranging from economics and psychology to physiology and philosophy, is facing mathematization. Computers, whose principle is purely mathematical, are composing music, playing chess, and have proved indispensable for calculating the trajectories of our a space crafts probing outer space. Bertrand Russell (1872-1970) the British mathematician, philosopher and Nobel laureate in Literature, said, "Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth but supreme beauty......without appeal to any part of our weaker nature......and capable of a stern perfection such as only the greatest art can show."

Suggested Books for Further Reading

1. *Men of Mathematics*—E.T.Bell.	(Simon and Schuster,) (New York.)
2. *Development of Mathematics*—E.T.Bell.	(—do—)
3. *Did you say Mathematics ?*—Ya. Khurgin.	(Mir Publishers,) (Moscow.)
4. *Higher Algebra*—A. Kurosh.	
5. *What is Mathematics*—R. Courant and H. Robbins.	(Oxford University) (Press.)
6. *One, two, three....infinity*—G. Gamow.	(Macmillan & Co.,) (London.)

The Indian Ocean : A Zone of Peace

Dhruba Jyoti Chakraborty

As the third big ocean, the Indian Ocean has always been important, the more so because of the vast land mass located along its coastline. Many important countries are generally associated with this ocean. Of these particular mention should be made of India, Indonesia and certain African nations like Malagasy and Keneya. During the middle ages the Arab merchants and sailors had established their sway over this ocean. The Arab eclipse was accelerated and followed by

European penetrations. The Portuguese had shown the way ; the British and the French followed suit. The massive British Empire in Asia and Africa made Britain the leading power of the Indian Ocean, with France occupying the next position. During the World War II, the ocean became a theatre of big power conflicts.

The end of the World War II created new problems, and the importance of this ocean assumed new dimensions. The British withdrawal from the east of Suez, the U. S. withdrawal from Vietnam, great power rivalry in oceans and the capability of new strategic weapons like Fleet Ballastic Missiles Submarines (F.B.M.S.) and Under Sea Long Range Ballastic Missiles have brought the Indian Ocean within the game of balance of power. The economic importance of the Indian Ocean is due to the fact that it contains the major trade routes of the world. The search for bases in the Indian Ocean has become a policy of Super Powers.

The main reason for an increasing Soviet Naval presence in the Indian Ocean is primarily not to challenge western interests but to counter growing Chinese influence in both Asia and Africa. China is now a long-term preoccupation of the Soviet government. Russia with friendly left-wing governments established in Sudan, Somalia and South Yemen are already strongly placed to control the southern end of the Red Sea. Sokatra offers Russia a more secure command communication and satellite tracking station than Aden. The Russians have also set up a string of small buoys along the East African coast, possibly as navigational aids for their rapidly growing force of nuclear submarines and also a string of mooring buoys for large ships along the African coast, opposite Malagasy, as far south as Durban. In July 1970 came an agreement between Mauratius and Russia for the use of Mauratian ports by Russian fishing and merchant ships and for landing rights at Plaisance airport, near the capital, Port Louis, for Aeroflot. If Russia can enlarge her own interests now and diminish western standing in the Indian Ocean at the same time, she certainly will, even while her real aim is to contain China.

What is the Chinese position in the Indian Ocean ? In the 'fifties China followed a land-based defence policy. In the 'sixties China began to support many littoral states against others, like Indonesia, Pakistan and Yemen in their confrontation with Malaysia, India and Saudi Arabia. Tanzaniya has become a major threat of Chinese involvement in this region. Armed revolution, guerilla warfare, economic and technical and, bilateral agreement (rubber and rice with Ceylon, for instance) are the ·means adopted by China to replace Soviet influence in a number of littoral and hinterland states. China is not yet a major naval power. Her entrances into the Indian Ocean are symbolic acts, as in April 1970, when Chinese vessels appeared off the Andamans. Also, she intends to use Western Indian Ocean Area of Tanzaniya for her ICBM tests. To convert the Indian Ocean into a zone of peace will involve not only naval limitation but also limitation of army and air force in the area.

The U.S. military establishment, and particularly its navy believes that sea power and its ability to exercise it is vital to the well-being of the free world. Some of the more articulate spokesmen of the navy are convinced that the U.S. navy must maintain a vigilant presence in the Indian Ocean. A long-time protagonist of a strong U.S. presence in the Indian Ocean, Admiral Mecain was one of the first persons to espouse the idea of a U.S. base in Diego Garcia. The U.S. administration had reached an agreement with the U.K. to expand existing facilities in this island and earmarked nearly 30 million dollars for that purpose.

In U.S. view, India has emerged as a major power in that region. Its status as an important sea-power in the region would grow. But the protection of the sea lanes leading from the Indian Ocean is too important to be left to the littoral states alone. The Russians may now have 20 to 30 combat ships in the Indian Ocean area, but they are bound to increase this force once they have an easy passage through a re-opened Suez Canal. The U.S. administration looks with concern at the Russian submarine construction programme and the plans for a carrier force with vertical take off aircraft. All this can mean only one thing—a major Russian presence in all the four oceans of the world, including the Indian Ocean. Russian naval ships and fishing trawlers even lie off the American mainland monitoring all the arrivals and departures of all U. S. ships.

Though littoral states like India, Sri Lanka, Australia and Newzealand have condemned the U.S. move at Diego Garcia the administration maintains that unless there is a clear understanding with Russia, the United States of America to keep its guard in the Indian Ocean. The ocean is free and no permission of littoral states is necessary to construct a naval base at Diego Garcia.

In view of the littoral states, the Indian Ocean should be regarded as a zone of peace—a view also endorsed by the U.N.O. How does the presence of navies of the Super Powers, the U.S.A. and the U.S.S.R., and perhaps, the British and the French on the outer fringes of the Indian Ocean affect India ? In peaceful time it does not matter. If unfortunately there is a World War and certainly it will be a nuclear war, then the countries on the shores of the ocean will suffer. There shall be several effects :—

(1) All the outward and inward trade routes of India traverse the Indian Ocean, oil being the most important commodity. Our merchant shipping will not be able to move freely; as a result, our economy will be shattered and the food position will be difficult.

(2) If nuclear weapons are employed by the warring nations, then there is a danger that some of these missiles may find their way to wrong places ; moreover, the effects of nuclear fall-out will be devastating.

(3) Again, there shall be undue and unacceptable pressure on many littoral nations to provide facilities for the navies. Some of them may be forced to take sides.

At Diego Garcia, the U.S.A. may locate nuclear weapons including missile-firing Polaris Poseidon submarines. From the Indian Ocean, the Soviet Union will be more vulnerable in range and direction. Diego Garcia will be a central location for a composite American fleet.

The conference of 82 non-aligned nations at Lina in August 1975 expressed deep concern over the expansion of the U.S. base in the Indian Ocean island of Diego Garcia and pledged to make further efforts for the implementation of the Lusaka declaration and the U.N. resolutions on maintaining the Indian Ocean as a zone of peace. The resolution called upon all littoral states to withdraw from military alliances conceived in the context of big power rivalry, and also to secure the removal of all foreign and imperialist military bases established in the furtherance of these alliances. The resolution also called upon all littoral and hinterland states to deny facilities to warships and aircraft of the Great Powers. It regretted the falilure of the Great Powers to co-operate with the U.N. committee on the Indian Ocean.

The U.S.S.R. has expressed its readiness to study the question of keeping the Indian Ocean as a zone of peace and to solve this problem, together with other powers on an equal basis. The U.S. response is negative. China remains silent.

In the context of the present weapons system and the Super Power strategy, the Indian Ocean area would retain its strategic significance not only for the two

Super Powers but also for Japan, China, France and Britain, who would like to develop even a modest second striking capability. There is no doubt that these powers would like to maintain and promote their respective influences in the area at the cost of others. The littoral states would, therefore, have to sustain high pressures from these foreign powers, if they wish to prevent the Indian Ocean area from becoming a hot bed of cold war rivalry and an area of future nuclear confrontation. Most littoral states are analysing several alternatives open to them—non-alignment, neutralization, denuclearization of the Indian Ocean and an Asian collective security pact.

There have been differences even among the littoral states. Ceylon was involved in refuelling of Pakistani aircraft ferrying re-inforcements to Bangladesh, during the liberation movement. India and Pakistan had naval encounters during the Bangladesh movement. During the internal rising, Ceylon herself accepted and was glad to have Indian naval assistance. Today, both India and Pakistan have submarines. For any navy to remain operational, weapons tests are necessary and only high seas provide range. The aim of keeping the Indian Ocean as a zone of peace is clearly to keep out extraneous powers only. The other alternative is to involve the spirit of the Indian Ocean community consciousness. Such a spirit would hinder the foreign powers playing the classical game of divide and rule. The evolution of such a consciousness may seem a remote possibility today, but one can work for it. The detente among the traditional enemies in Europe, or the possibility of the evolution of a Mediterranean consciousness are examples which should make us confident that the emergence of an Indian community may, after all, not remain a dream.

TAILPIECE

In its reports, the State Department declared : "The situation in the Indian Ocean cannot be considered in isolation from past and possible future events. On the African mainland, Soviet activities in Angola and the Soviet build-up of facilities in Somalia have raised major questions about the intentions of the Soviet Union in areas bordering on the Indian Ocean. We are now seeking to encourage the Soviet Union to conduct itself with restraint and to avoid exploiting local crises for unilateral gain. We could not consider seriously an arms limitation initiative focussed on the Indian Ocean without clear evidence of Soviet willingness to exercise restraint in the region as a whole."

[Extracct from an article *U.S. Stand on Indian Ocean Issue Explained* by Warren W. Unna, published in **The Statesman**, 23rd April 1976]. —Editor

Of You and I : Variation on a Theme

Ananda Lal

[*The characters of the play are U and I, let us say two normal human beings. They are young. They could be two men. or two women, or they could very well be a man and a woman. It all depends on what you think.*

There need not be any stage. The only essential stage properties are a telephone placed anywhere but the centre of the acting area, and two makeshift seats for the two actors placed at diametrically opposite ends of the acting area, separated by about twelve feet.

Under no circumstances should bright lighting be used. The play must be staged in dim lighting , only two bright circles of light focused on the two actors might be allowed.

It would be preferable not to use a curtain before or after performances, in case a stage is used. The play opens in pitch darkness. A spotlight picks out I, sitting facing the audience.]

U's VOICE (*offstage*) : You don't understand what's happening, do you ?
I (*in a trance*) : No.
U's VOICE (*offstage*) : I suppose when this is over you will have to do something ......for a living, if nothing else.
I : I know.
U's VOICE (*offstage*) : Don't you *want* to do anything ?
I : I...no.
[*There is a long pause.*]

I *(In the same tone)* : We are waiting. Waiting to know what they think of us. Even if they approve, I feel, we will still be waiting, for something, someone. [*Blackout. When the lights come up again, it could be a day, or a week, or a month, perhaps even a year, later. I is sitting on the same seat, U on the seat nearer to the telephone.*]

U : So they didn't think much of us.

I : Well, we never thought much of them.

U : What do you intend doing now ?

I : Wait for him to phone and give us instructions.

U : They haven't left us with any other choice.

I : You 'd think they would have let one of us go.

U One could have been permitted—it would have been enough.

I : Instead, what do they do ?

U : They keep all of us back.

I : They *are* vindictive.

U : Malicious.

I : They knew we wanted to go.

U : Cruel.

I : They deliberately disapproved.

U : Evil.

I : People make me sick.

U : They *are* disgusting.

I : My future is ruined.

U : Our future is ruined.

I : It means another long wait.

U : Like the last one.

I : Our last hope is him and the phone.

U : He will tell us what we must do, won't he ?

I : Yes.

U : (*After careful consideration*) : Are you sure he will phone ?

I *(Irritated)* : Of course, I am. I know, he will.

U : I mean, did he tell you he would ?

I : No, he did not, but there is nothing else for us to do, is there ?

U : You 're right. There isn't. Still......

I : What ?

U : Just in case he does not ring up, where does that leave us ?

I : But he must. He can't abandon us like this. We have been waiting so long, it's about time he phoned.

U : I just thought of something.

I : No doubt, you did.

U : He may not have been able to ring up so far.

I : Why not ?

U : Because our phone may be dead.

I : I never thought of that.

U (*Standing up*) : Shall I pick up the receiver and check ?

I : And if he decides to phone now and finds it engaged ?

U : I won't take long. Just hear if the dial-tone is there.

I : All right.

U (*Delightedly goes over and picks up the receiver, listens to it*) : It's working.

I : I knew it.

U (*A trifle disappointed and concerned, returns to the seat*) : There's nothing wrong with the phone.

I : That means he hasn't tried to get us yet.

U (*Persistent*) : But our phone may have been dead some days back.

I : So what ?

U : If he had tried to get us at that time it would have been dead.

I : How does this assumption help us ?

U : Shall I ring up the telephone company and enquire if our line has been dead in the past few……

[*The telephone rings. I suddenly becomes highly tense.*]

U (*Rushing to answer it*) : Hello··*(a long pause)* No, I'm sorry, you have got a wrong number *(puts down the receiver)*.

I : Who was that ?

U : I don't know. He wanted zero-seven-one-six-two-five-three-double four-three-five-two-six-one-seven-zero. *(Triumphantly)* Our number is zero-seven-one-six-two-five-three-double four-three-five-two-six-one-*seven-seven.*

I : You mean you didn't even ask him who he was ?

U (*With an air of finality*) : It wasn't necessary, was it ?

I : He could have had the numbers mixed up—everyone makes mistakes. It could have been *him* ! You hang up without even knowing who it was—how do you think this kind of attitude will ever get us anywhere ? Use your brains for a change.

U (*Meekly*) : My brains haven't been approved of by them.

I : I'm inclined to support them whole-heartedly. (*Moodily begins tracing designs on the floor with his fingers.*)

U *(To the audience)* : You see, he's disillusioned : he isn't usually like this. You would behave like him too if you were in his position. I had not expected much from them anyway ; that's why, when they finally told us that we weren't good enough, it didn't affect me too greatly. Not as much as it affected him. He had based his whole future on their judgment—he expected a lot from them, he expected them to approve of him. Only then (he used to tell me) would he be able to do something worthwhile. And ever since they rejected our work, he has been in this temper. He doesn't know what to do next. I ask you, would you know what to do when people like them suppress you continuously ? So he's waiting for this phone call. If you want to know who he thinks is going to ring him up, don't ask me. (*Lowering his voice lest he is over-heard*) I don't know what or whom he's talking about ! But he keeps saying that this person *will* phone, and *will* tell him what to do next. You want to know what *I* am doing here ? Well, I·· I *like* him. I depend on him. I don't want to leave him, you know—he really is a nice sort when you get to know him well.

I (*Still engrossed in his thoughts*) : Whom are you muttering to ? (*Looks up, peers at the audience.*) Oh, them. You think they are going to sympathize with us ? You have some hope. I can see them fidgeting in their seats wanting to get away. They are not like us. They have got everything·· and nothing. We bore them.

U : You don't want me to talk to them ?

I : What's the use ? It's like talking to a herd of cattle. They won't respond. Shall I tell you why they've come here ? Because it is a social event. Everyone they know is here, so they must be here too. We are only entertaining them. (*Getting into a sermonizing mood*) They will go away and discuss us for the next month over their coffee tables. But do they care at all about us ? No. They will ask each other whether they saw you and I, and how terribly boring you and I were. But their main interests are whether everyone has taken notice of how absolutely gorgeous they are looking tonight, and which is the fastest way to make some easy money tomorrow morning. That is what they are thinking of. Go ahead, ask them. See what they answer.

U : Would you like to eat something ?

I : Don't be silly.

U : I just wanted to change the subject.

I (*Not to be sidetracked*) : They don't even know what is right and wrong. Frittering away their lifetimes, that's what they are doing. That's what we are doing too, waiting for him to phone. But there is a difference between us and them. Yet sometimes I wonder what that difference is.

U : Why don't you ring up one of your friends ?

I : And suppose he decides to phone at that very moment and doesn't get our line ?

U : True. We can't afford to let that happen.

[*The telephone rings.*]

U : Should I get it ?

I : No, you 'll bungle everything Let me answer it. *(Goes across, picks up the receiver)* Hello ?......Oh, hello ? How are you ?......Yes, I'm still alive. No need to prepare my obituary as yet......I didn't know you were in town...... You didn't know *I* was ? Yes, I suppose I have not been out of doors very recently......I've been at home most of the time ; in fact, all the time...Well, nothing really—just waiting for a friend to ring up now and then......Really ? Congratulations ! When is the big day ?......I see...How true...yes...Indeed... I agree...Listen, I'm waiting for an important call that's supposed to come through any minute. Yes, it's very important. *I* will phone you sometime, all right ?......You 're going out of town ? Oh, good !......No, I didn't say anything. Good bye. *(Puts down the receiver.)*

U : Suppose he had been trying to get our number all this time you had been talking ?

I *(Comes back, sits down)* : It's not my fault. I got rid of him as fast as I could.
[*And so it continues. Until some time, some day, when......*]

U : Look ! *(Pointing it out on the floor)* A flower.

I : Pick it up and pluck its petals one by one.

U : No. Let it grow.

I : He will phone, he won't phone, he will phone, he won't phone, he will......

U : Let it grow.

I : He won't phone···

U : Let it wait like we are. Let it wait with us.

I : He will phone···

U : Let it fade with us. Let it dry up like we will.

I : He won't phone.

U : How long must we wait ?

I *(Trying to sound impressive)* : They also serve who only stand and......
[*The telephone rings.*]

U : Wait. *(Reaches out, answers it)* Hello.
Hello.

HELLO.
(To I, who has come up closer to the phone) There's no answer. He isn't saying anything.

I *(Taking the receiver from U) Hello ?*
Can you hear me ?
I know it's you.

Why don't you answer ?
Say something.
Tell me what to do.

You must.
(To U) There's no answer. He isn't saying anything.
(Shouts into the receiver) Tell me something, anything.
Let me know your name.
How can I meet you ?

What should I do ?

(To U) He is absolutely silent. What should I do ?

U : Put the receiver down.

I *(Shouts into receiver)* : TELL THEM I CAME, AND NO ONE ANSWERED, THAT I KEPT MY WORD. *(Replaces receiver)* He didn't even talk to us. Not one word *(sits down)*.

[*The telephone rings and continues ringing.*]

I : It's him again.

U : Don't answer it.

I : Why not ?

U : He won't answer you.

I : He may.

U : You have done your bit.

I : He might only have been testing me.

U : If he orders you to do something, would you obey without hesitation ?

I : What do you mean ?

U : Would you do whatever he tells you to do ?

I : Yes.

U : If he told you to kill yourself right now ? (*I is silent.*) If he told you to leave me ? Would you let him come between us ?

[*Blackout. The telephone continues ringing. The lights come up again gradually. It could be a day, or a week, or a month, perhaps even a year, later. U and I have interchanged places.*]

I : *You* and I ?

[*He walks slowly to the telephone, pulls the cord out of its socket. The ringing stops. I returns to his seat, the two look at each other as the lights fade out.*]

On the Materialist Historiography of Science

Sumit Ranjan Das

A historiography of science which is acquiring immense popularity may be termed a materialist historiography in the sense that it explicitly asserts the dependence of scientific progress on economic factors. Much of the earlier historiography belonged to the internalist tradition which maintained that the progress of science can be adequately understood and explained on the basis of science alone. Science was viewed as a continuous, cumilative progess having a linear development guided only by the factors of rationality and logic. Rationality and logic were thus given an atemporal character—it was implicitly assumed that the logic and rationality of science in all times were identical to that of the present.

T. S. Kuhn[1] brought about a major change in the historiography of science by demonstrating the role of dogma and other extra-rational factors in science.

---

[1] See T. S. Kuhn : *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago, 1965) and *The Copernican Revolution* (Harvard, 1957).

Scientists, Kuhn argued, are always committed towards a definite working model of the world, a definite set of preconceptions called a paradigm.[2] Normal science consists of the attempt to bring out conformity of the paradigm with nature. Anomalies are, however, always present and these are approached by the normal scientist as 'puzzles'. A time comes when a large number of anomalies leads to a crisis. And in the crisis state, new paradigms are born which compete with the reigning one. When one of the new paradigms succeeds in gaining dominance, a scientific revolution results.

Though Kuhn's scheme is essentially correct, his historiography is inadequate. Its inadequacy lies in its level of explanation. It fails to explain why certain intellectual trends, and hence certain paradigms are dominant in certain periods. It does not explain the methodological and conceptual *continnities* in science after a scientific revolution. It never attempts to explain the essential characteristics of science as a social activity with its various functions.

It is instructive at this stage to recall Marx's historic statement : 'The philosophers have only interpreted the world, in various ways ; the point, however, is to change it.[3] It is often complained, and sometimes rightly, that the present state of science is deplorable. If that is so, a historiography of science must provide the means to discover the root of the evil, and must point to the direction in which a desirable change can be brought about. To this positive demand, Kuhn's historiography as well the internalist traditions fail to respond.

At this stage, the materialist theory offers both a higher level of explanation and also a positive response to the demand mentioned above. It is not surprising that the materialist historiography had its foundation in Marxism. And because of its political colour, the materialist historiography has been exposed to vehement attacks. The attacks are not unjustified. Nor are they banal. And in front of these attacks the materialist theory stands helpless. The basic reason for such helplessness is the failure of the proponents of the theory (e.g., Bukharin, Bernal, Needham, Crowther) to elaborate the central thesis. Consequently there has been a host of ambiguities.

The purpose of the present essay is to eliminate some of these ambiguities and in the process stimulate discussion and debate. This article has no claim to be any kind of exposition of the materialist historiography. That needs a much more detailed study, and a study of specific historical situations. We shall rather confine ourselves to a discussion of some central questions.

---

[2] See Kuhn : *The Structure of Scientific Revolution*

[3] Karl Marx : *Theses on Feuerbach.*

II

The most widely articulated and most vehemently attacked assertion of the materialist school is that scientific knowledge is a product of social necessities. And the origin of most misunderstandings is the ambiguity of the term 'necessities'. The 'necessity' hypothesis does have a tremendous liberating force for the practising historian of science in that it refutes, with historical evidence, the vulgar Science-for-science's-sake theory. However, in attacking this idealist position most materialist historians go to the other extreme in maintaining that the only necessity of man is what is called "economic" necessity, the bare necessity for survival.

The standard argument against this hypothesis is that man is, by nature, curious to know about the world he lives in and science is a result of this urge to know. That is why, much of science is "useless" knowledge.

No sane person can deny man's basic urge to know. But the world is infinite and there are infinite facts to know. *How* does man select from this infinitude what to know and what to leave for the future ? This is a question which the historian of science must answer in the true *historical* perspective.

The basic mission of man is to fight nature and to fight nature it is indispensable to know nature. This is the basic source of scientific knowledge. In his attempt to know nature, man changes nature and changes himself too. Nature becomes a part of man just as man becomes a part of nature. This knowlege is acquired not by a single individual in an isolated fashion, but by co-operation with other men, in an integrated way. The essence of knowledge is, therefore, *social.* Man therefore selects for detailed study that part of nature which is most important for his historic struggle. But to fight nature man has to study nature not only systematically, but also beautifully, in all its manifold forms. The cave men found it essential to draw pictures of animals they were to kill. And that is art. So man wants to know things in detail, with rigour ; he wants to know things for living beautifully, not just living barely. This gives rise to what is often called man's spiritual necessity, and this kind of necessity also contributes towards the development of science.

We have seen how man's basic urge to know arises as a product of the need for survial. Men differ from animals in that he produces in anticipation, also in that he *know*s in anticipation. Consequently this urge to know does not manifest itself in an attempt to know whatever is present in a random fashion—rather men select between what to know and what to leave for the future. This selection is guided by social necessity.

Let it be further noted that once the urge to know is generated, it itself becomes a part of man's social needs. The process is dialectical and knowledge arises of a constant dialectics between man's urge to know and his needs. Neither is it possible to differentiate between man's "spiritual" needs and "economic" needs. Man's need is basically one in essence—the *human* need, the *social* need.

At this stage an important question arises. It is sometimes argued that science, particularly in the present century, seems to satisfy needs which are definitely not "human" needs. Science helps the production of dangerous weapons designed to kill men. Is this "human" ?

Let it be noted that society is never a uniform, homogeneous unity. Owing to the division of society into social classes, *some* of the necessities of one particular class may not be the necessities of another class. Which necessity does science serve ? The verdict of history is that in all normal situations, science serves the interests and hence the necessities of the ruling classes. The word "normal" has two implications. First, there are periods of turmoil when opposing classes are not in equilibrium and there is no unequivocal "ruling" class. Secondly, the statement is valid for all class societies, and all societies in which science flourished have been class societies. It is a real necessity of the present bourgeoisie to devise means of destruction, because modern capitalist economy is essentially a war economy. In periods of turmoil, when one of the oppressed classes is in conflict with the ruling class and have gained enough power, the former also develops their own necessities and their own science. Thus, astronomy was an important branch of science during the Renaissance because the rising bourgeoisie had to study the subject to ensure success of their "explorations". Thus the desire to kill men is also a human necessity, the necessity of the borgeoisie. What is important is that it is not desirable for the vast majority.

It is essential to sound a final warning before we end our discussion of the problem of necessities. Science develops when there is a social need for it. But whenever there is a need there is not always a corresponding science. There are determined efforts to satisfy the need, but the effort is not always successful. Otherwise there would have been no problem in science. The existence of problems is precisely the challenge, and therein lies the romance of science.

We shall now briefly discuss another important assertion of materialist historiography—that the character of science in a given period is determined by the contemporary socio-economic structure.

III

Usually this assertion is explained by the proponents of the theory by refering to some individual scientific theories whose contents appear as direct "reflections" of corresponding socio-economic phenomena. Science is pictured to be a component of a presumed "superstructure" and scientific ideas are seen as direct consequences of the socio-economic "base". The realtion is supposed to be direct, uninvolved, with an one-to-one correspondence.

Most of the attacks on this particular assertion of the materialist historiography arise owing to the vague and simplistic nature of its exposition. Critics of the theory consequently ridicule such an assertion, mocking it as a fit of infantile imagination.

Before discussing the question in detail, let us discuss what is meant by the *character*, the *content* of science. To understand what these two terms connote it must be accepted that science is neither philosophically, nor ethically neutral, as some historians suppose. This is a question dealt in detail by many historians of science,[4] and we have no intention of repeating the discussion here. As mentioned earlier, Kuhn has shown that science develops on the basis of a set of presuppositions and preconceptions, a matrix of accepted ideas constituting a paradigm. And scientists are committed almost dogmatically to one paradigm or the other. In so far as science consists of such preconceptions, it is easy to see that there are various "kinds" of science in various periods of history. One can, therefore, talk of a character of science. The other aspect of the question is the existence of science as a social activity. As such an activity it has various functions, one of which is technology. Now, for various kinds of society (i. e. various modes and relations of production) there are various ways in which science executes its functions. Moreover, in different societies science has different functions altogether. In this sense, too, one can talk of a character of science. The concept of a character or content of science is a direct consequence of the assertion that science is essentially a social phenomenon.

Let us now revert to our main problem. The base-superstructure model which envisages an one-way flow from base to superstructure without any kind of feedback is inadequate. One need not go to subtle flaws in such a scheme. Rather let us refer to actual practice. Recent experiences have shown that what are regarded as elements of the superstructure play a significant role in transforming the base. One can only refer to the tragedy of the Soviet Union. The base is undoubtedly and unquestionably socialist, but distortions in the culture are continually tending to pull back on the base. The Cultural Revolution in China is a positive admission of this fact and an attempt to prevent the 'soiling' of the economy by superstructure. The base-superstructure model does not, therefore, treat the interaction between economy and ideas in its all-embracing, total perspective.

---

[4] Brian Easlea : *Liberation and the Aims of Science* (Sussex, 1973).

In their various kinds of activity men come to possess certain ideas and conceptions. It is not possible to connect each idea with a distinct activity. Rather social activity as a whole, or Praxis[5] generates social ideas and social consciousness. This process, too, is dialectical. Once the ideas are generated, they become an integral part of the praxis and is instrumental in both transforming itself and transforming praxis. Owing to the different position of various social classes in relation to production, the various classes have some different activities, leading to the formation of different praxis. Consequently, different classes possess different ideas, and one can speak of ideas characteristic of particular classes. Abstracted from these real ideas of real men, it is possible to form general frameworks of thought, a general world-view, an ideology. Ideology is thus essentially an abstract concept, whose validity lies in its utility in explanation in the social sciences. Ideologies are framework of ideas which explain the behaviour and activity of particular classes qua classes.

Questions may be raised as regards the "reality" of such concepts as ideology, since the concept is after all abstract. However, the concept of ideology expressed the integrated fashion in which praxis generates ideas. The concept is as real as the concepts of mass and temperature in physics. The thoughts and ideas corresponding to a given ideology may not be reducible to individual thought patterns.

It is because ideology becomes a part of praxis the moment it is generated, that ideology can act upon individuals as causes. The fact that ideology has a class character does not imply that individual members of the class necessarily hold corresponding beliefs. The class ideas remain latent in some individuals, while they find expression in others. Further, a given class ideology may be believed even by individuals *not* belonging to the class in question. This is because ideology, being a part of praxis influences the thought processes of any individual to some extent. Opposing class ideologies do not form water-tight compartments.

We devoted much space to the discussion of ideologies and their relation to the economy of a society because science cannot be separated from ideology. This does not imply that science is identical with ideology. The relation between science and ideology is a dialectical one at a higher level. The paradigms of science discussed earlier consist of conceptions rooted in ideology of a particular class. Neo-Platonism was thus a significant and essential part of the Copernican paradigm because it conformed with the ideology of the newly rising bourgeoisie. Again, the idea that nature is manipulable and controllable, an idea basic to modern science, is also a bourgeois idea in the sense that the idea is a result of the activity of the bourgeoisie in manipulating and controlling the machine and the market. Since it is a general fact of history that the dominant ideas are those of the ruling class, it follows that in ordinary situations the ruling paradigm corresponds to the ideology of the ruling class. However, when one class is challenging the ruling class in a fierce class struggle with enough power, the ideology of the former class becomes as powerful as that of the rulers. One finds a corresponding period of crisis in the sciences. The process does not, and cannot take a mechanistic course. A scientfic revolution does not occur the very instant and at the very place when and where the oppressed class in question gains political and economic power. This follows from the fact that changes in the economic structure do not immediately motivate changes in ideology and other institutions and ideas[6]. The paradigm shift, or the scientific revolution associated with a given socio-economic revolution is the result of the effect of the new ideology and the new praxis on science. (At this point it is important to note that paradigmatic beliefs formed as a result of interaction with ideology, once generated, becomes a part of ideology and hence of praxis.) Consequently the scientific revolution may also precede the political revolution. It can take place the moment there are a large number of unsolved anomalies within the existing paradigm, and a new ideology is powerful enough to provide the basis for a new paradigm.

---

[5] The word Praxis is used in the Marxist sense of the term. For an elaboration of the concept, see Henri Lefebvre *The Sociology of Marx* (Penguin, 1968).

The most important aspect of the relation between the character of science and economic factors is the relation of paradigms to class ideologies and hence to the socio-economic structure of the period. As discussed earlier, this does not in any way imply that scientists committed to a paradigm are also committed to the corresponding ideology and must belong to the corresponding social class. The other aspect of the character of science, namely, the nature of science as a social activity, may be clarified with the following examples. First, while science in the Middle Ages was confined to the universities, with the transcendence of feudalism by capitalism, science came nearer to the general mass by creating technology as one of its aspects. Secondly, because science in capitalism serves the interests of the bourgeoisie science can come to the full service of the entire population only under socialism. Further while owing to the fact that competition is the basis of capitalism, science in capitalist countries is not planned ; in socialism science is planned, since ownership of the means of production is social and production is itself planned. The above characteristics of science in a socialist system have not been fully realised in our socialist countries owing to definite reasons but there has been definitely a partial realisation. It is optimistic to note that cultural developments in certain socialist countries promise a brighter future.

---

[6] See the preceeding discussion on base-superstructure model.

The above discussion throws light on the question as to why there are conceptual and methodological continuities in science. This is simply because new paradigms are born out of old ones, and elements of the older paradigm which do not give rise to anomalies and do not conflct the new ideology remain unaltered, though they exist in a broader fashion. Scientific revolutions are discontinuities no doubt, but they are at the same time continuous in the above sense.

IV

In the introduction to this essay it was expected that the materialist historiography would provide a means to transcend the present state of science which seem to be deplorable for various reasons. To make the case more specific let us explain an aspect of the present science beautifully discussed in Brian Easlea's book entitled "Liberation and the Aims of Science". Present biologists are now trying to devise means by which the human brain can be externally controlled and even made to feel "continually relaxed, happy or even ecstatic".[7] The political implications of such a project in such an oppressive system as capitalism are obvious. This would mean a kind of thought control by which the oppressed and alienated men can be made to feel as if they were not oppressed and status quo would be wonderfully maintained. The materialist historiography enables us to trace the root of such an idea. We saw earlier how the idea of nature as controllable is an essentially bourgeois idea arising out of the private ownership of the machine. During the Renaissance the idea had a tremendous revolutionary implication. But capitalism also reduces man to a commodity (specifically, it makes human labour power a commodity) and hence regards man also like other material commodities. If that is so, man is nothing but a machine ; and since a machine is controllable, man must be also controllable and manipulable. Thus the idea of manipulation when extended to man becomes a perverted idea and sounds danger. What then is the diagnosis ? Should we give up the study of bio-physics ? Definitely not. Because we can continue our bio-physics *minus* the idea of manipulation. For that capitalism must be transcended by socialism. Such a transformation in the economy will definitely not solve the matter. This is clear from our discussion on the base-superstructure model. What is essential is therefore a *cultural* transformation together with an economic transformation (in the absence of a new economy the new culture cannot be stable), and this cultural revolution must be *consciously* organised if science is to provide benefit for man.

---

7. Easlea, op. cit. p. 262 (a quotation from an article by Woolridge)

The Dawn of Hope

Kavery Bhattacharya

Earth's bosom was stained
with tears and blood
of man—
weak and dissipated with the madness
born of a frenzy of boredom.

Life was stale :
rancid smoke of hashish
blurred the diamonds in the sky ;
fat flies
scorned heaps of stinking trash
and the bitterness
of disillusioned love-making :
the mockery of birth—
the aimless propagation of an exhausted race....
foul smell of sweet foretold death
when the breeze died with the sun.

Evil stillness.
Shattered
by the wind's death lament
as if uprooted in glee,
lightning struck and the earth opened
and swallowed the ashes of corruption.
And then the rains :
the dawn of Hope

The Heritage of Indian Art

Sudakshina Kundu

Art plays the most vital role in documenting the history of the majestic civilisation of India. It gives an expression to the spirit and ideal of the country through the ages. Indian art is essentially conservative in its outlook and traces a continuous evolution from pre-history to the present day in a unique fashion. The evolution is not sudden. It has taken place gradually by 'process of accumulation by juxtaposition of old and new'. It is in its own way receptive of new ideas.

The earliest signs of Indian art date back to 3000—1500 B.C.—days of the Dravidian civilisation of the Indus valley. The influence of Mesopotamia and Egypt on the Dravidian art is accounted for by the martime trade that flourished between the countries. In spite of the foreign influence, India seems to have preserved her originality. This is evident from the animal figures on the steatite seals, found in Harappa and Mohenjo-daro, which are much more than just the Egyptian hieroglyphs. The main features of the sensitive style are the perfect outlines, but the bodies are pulsating with life. The other wonderful specimens unearthed during the excavation of Mohenjo-daro and Harappa show the astounding originality and imaginations of the Dravidian craftsmen.

The Indus Valley civilisation crumbled under the invasion of the Aryans—a nomadic tribe of cattle-herders. They poured into the Indus and Gangetic planes during 1500 B. C. where they later settled down. The flow of art was interrupted at this stage for about two millenniums. This was predominantly a period of literary activity. Thus the eighth century B.C. saw the birth of the Vedas. Meanwhile the philosophic thought of the Aryans and the complex heritage of the conquered races blended into each other, resulting in the subtle 'manifold spiritual tradition' called Hinduism. Art was again revived under the Maurya dynasty that came to power following the conquest of Alexander the Great. The coming of the Buddhist doctrine during this period, that is the fifth century B.C., overshadowed the Vedic culture.

At the early stage, Buddhist art was very much unrefined and commonplace, because the earliest Buddhist monks regarded art as a sensuous luxury. The new era of Buddhism started in India under the patronage of king Ashoka. The influence of the Persian court is reflected in the art of the Mauryan India. The famous pillars and monuments of the Mauryan emperor, Ashoka, are the relics of the Persian-influenced 'proud and heraldic imperial art'. The ancient examples of Buddhist art are the Stupas (relinquary)—the famous one is the Stupa of Sanchi—a brilliant sample of early Buddhist architecture (third century B.C. to early first century A.D.). The Chaityas or cave-chapels and the Viharas or monasteries are also striking examples of Buddhist art. The facades and interiors of the caves bear pictorial representations from the popular Buddhist legends and myths. The graceful figures of the Yaksa kings and queens, taken from the timeless folk beliefs of pre-Buddhist India, decorate the Stupas of Sanchi and Bharut. They symbolise the victory of the Buddhist doctrine over the earlier cult. The beautiful severe designs of the Chaitya halls weave an intellectual atmosphere.

The Buddhist and Hindu architecture flourished side by side since the Maurya period. Although each underwent gradual transformation, they retained their individual characteristics. The Hindu art consists mainly of the temples and cathedrals.

After Alexander withdrew from Asia, a large number of his generals established kingdoms in the Orient. With them the Hellenistic culture slowly made its entry into the Indian scene. The Maurya dynasty was overthrown by the invasion of the Scythians or Sakas and the Kushanas during the first centuries B.C. and A.D. The Kushanas finally established themselves in Northern India. Under the Kushana patronage, the Hellenistic colony flourished in the so-called Gandhara art and a local tradition was born in Mathura. This was radically different in style from its contemporary Gandhara school. The red sandstone images with serpent hoods, derived from the ancient Naga heritage, form the striking features of the Mathura school of art. The Mathura school of art is essentially traditional. The Gandhara school is greatly influenced by the Hellenistic style, as seen from the statues of Buddha in attitudes of repose. The Mathura Buddhas are more vivid and lively than their Gandhara counterparts exhibiting serene aloofness. The Kushana style, being Mongolian in origin, stands apart from the impressionistic Gandhara style and the sensitive Hindu art. It is bold and magnificent in its expression. The new forces of Mathura, Gandhara and Kushana styles synthesised with the complex, partly pre-Aryan tradition to emerge as the harmonious, classical perfection of the Gupta era which came to be known as distinctively Indian. Thus, Indian art became an expression of her religious and aesthetic conceptions. It was infused with symbolism.

The famous bronze statue of Shiva—Nataraja, the king of dancers, from South India is a typical example of symbolism in Indian art. He represents the eternal energy in five activities (pancha-kriya), namely, (i) creation (*srishti*), (ii) duration *(sthiti)*, (iii) destruction *(samhara)*, (iv) concealing *(tirobhava)* and (v) favouring *(anugraha)*. The "Vahanas" of the gods and goddesses symbolise the nature of the divine being or force represented. For example, the elephant head of Lord Ganesh signifies his ability to remove all obstacles from the path of a devotee. His vahana, the rat, is no less efficient than the elephant as a finder and maker of way.

Through the gradual evolution or the classical style in Indian art, the Indian ideal of beauty underwent a radical transformation. The early figures that were voluptuous and massive, were replaced by subtle, graceful statues heaving with a divine, inner life-force. The classical Indian statues not only come to life with natural grace and vitality, they also seem to embody the artists' spirit, realism and ideal of beauty.

Meanwhile, Central and South India became centres of Hindu architecture. Temples were being built after A.D. second century in sharp contrast to the Northern Aryan style. The temples reveal the Dravidian tradition of many-storied structures with a 'definite horizontal emphasis'. There are four towering gateways on the four sides of the temples. In the north, the chief spire is the 'sikhara' just above the 'garbha-griha'. The Hindu civilisation survived the Hunnic and later the Islamic iconoclasm in the protected South ; while the North suffered greatly. The striking examples of Hindu art and architecture are the temples of Mahavalipuram, Aihole and Ellora in the South, and Bhubaneshwar and Konark in Orissa. The other splendid contribution of the South to the treasury of Indian art is the bronze images of the Chola period. The delicate designs and superb contours of the bronze statues represent the extraordinary sophistication of the Indian craftsmanship.

The Jaina art, that flourished along with the Buddhist art, is an entirely different chapter. Although it follows the great general evolution of Indian art, it has retained its own characteristics which are comparatively uncomplicated. It adheres to a stiff archaic ideal and is, perhaps, the only art in India which depicts absolutely unclothed figures. The nakedness is said to symbolise complete detatchment from the worldly life. A sharp contrast to the 'sublime gentleness and serene grace' of the Buddha, the Jaina images seem to be haunted by a frozen atmosphere.

This brief survey of Indian art will be incomplete if we do not consider the rich and dainty style of Bengal under the Palas and Senas between A.D. seventh and thirteenth centuries. The smooth black slate Pala images reflect an elegant design and a splendid technical accomplishment in their clear-cut designs that resemble metalwork. The beautiful *terracota* temples of Bishnupur show the height of perfection attained by the artists.

Little still remains of the paintings of ancient India. The best example is the cave frescos of Ajanta which are awe-inspiring. The Rajput paintings, illustrating the love of Radha-Krishna and Rama-Sita are simple, passionate and charming. The effect is two-dimensional, and call for detailed work and intricate designs. According to Dr Coomerswami, the Gujrati (Jaina) paintings (A.D. 1100-1600) are a continuation of ancient Western style. The tradition of Pala paintings (A.D. 750-1250) is still continued in Nepal today.

Thus, throughout the ages the heritage of Indian art is being enriched by the influence of varied styles which are accepted by the Indian mind and transcreated so as to gain a unique position in the world of art.

BIBLIOGRAPHY

A History of India (Vol. I)—Romila Thapar.
Landmarks of the World's Art—The Oriental World.
Myths and Symbols in Indian Art and Civilization—Heinrich Zimmer.
The Art of Indian Asia—Heinrich Zimmer.

Estimating India's Potential Mineral Resources

A. K. Saha

Minerals are a wasting asset for any country. Unlike plant and animal products which renew themselves or can be made to renew rapidly ; the rate of formation or growth of mineral deposits in nature is extremely slow. Except, perhaps, for a few surficial mineral deposits, such as deposits of common salt and gypsum (which form by evaporation of sea water), the rate of growth of minerals is insignificant compared to the life span of human beings, or even of human civilization.

In exploiting mineral deposits, modern man is consuming natural products which formed slowly and gradually over millions of years ever since the earth was born some 4·5 billion years ago. The coal that we are now consuming in India at the rate of nearly 90 million tonnes per year was deposited in the swamplands of central and eastern India some 250—200 million years ago. The iron ore deposits which are now being exploited for running our steel mills and for exports were formed in very ancient times—between 2·0 and 3·0 billion years ago.

Ever since the Industrial Revolution, man has turned increasingly to exploitation of mineral deposits for his needs. In fact, usage of metals has been increasing exponentially at a rate much faster than the growth of the world's population. It has been estimated that between the years 1975 and A. D. 2000, world demand for the commonly used metals would increase by a factor of four. Similar estimates of demand have been made for coal and petroleum, and various other mineral commodities.

This ever-increasing exponential growth of demand for minerals and metals is being met by new discoveries of economically workable sources as well as by faster exploitation of the known mineral deposits and better technological methods to process inferior grade mineral deposits. Until about twenty-five years ago, discoveries of mineral deposits did keep pace with the rate of exploitation, because for most minerals, easy-to-find, near-surface deposits were readily available. However, within recent years new discoveries of mineral deposits have not been able to keep pace with the rate of depletion. Because the easy-to-find mineral prospects are gone and fewer prospects are being found by use of traditional methods, earth scientists have been at work to develop more and more sophisticated techniques of mineral exploration in order to meet this challenge. A new philosophy of exploration involving team work among geologists, geochemists, geophysicists, engineers, statisticians and computer-scientists is now taking shape.

Now, intensive exploration efforts using more and more sophisticated techniques are expected to reveal new mineral deposits. But these techniques will enable the discovery of mineral deposits if they really exist ; they cannot *create* new mineral deposits. So there is a limit to new discoveries. Already, there is evidence to indicate that in a few intensively explored countries, such as the U.K. and the U.S.A., there is hardly any scope for new discoveries of a few mineral commodities (such as ores of lead) as could be exploited under the *existing* economic technological and economic conditions.

At this stage a few terms might be defined. The term *Reserves* refers to *economically recoverable* material in identified mineral deposits, while the term *Resources* includes (a) known reserves, plus (b) reserves not yet discovered but expected to occur on the basis of our geological knowledge, plus (c) identified deposits that could be exploited under more favourable economic conditions and improved technology.

Within recent years attempts have been made to estimate the resources of specific metals and mineral raw materials. It must be noted, however, that natural systems are inherently complex and that our understanding of the processes leading to mineral concentration is incomplete. There is, therefore, no full-proof method for estimation of resources.

One of these methods is based on the abundance of particular elements in the earth's continental crust (i.e. the outer 35—40 km. shell of the earth's continents). The useful elements, such as iron, copper, nickel, cobalt, lead and zinc are all present in small quantities in the rocks which constitute the crust. Only where these elements are concentrated sufficiently do we get economic mineral deposits. Estimates have been made of the average crustal abundances of these elements based on hundreds and thousands of analyses from all over the world.

McKelvey (1960) found that for most intensively explored metals like lead, molybdenum, copper, zinc and gold whose exploration has been persued for a long time :—

$$R = A \times 10^{9-10} \qquad \text{……………………(1)}$$

where R=resources expressed in metric tons,
and A=mean abundance of the particular element in the continental crust (expressed in per cent).

The value of R has been found to be the highest for lead which is $2.45 \times A_{Pb} \times 10^{10}$.

Using McKelvey's relation and *assuming that all the lead reserves in continental U.S.A. have in fact been discovered,* Erickson (1972) deduced the following relationship to indicate the resource potential for any metal in the U.S.A. :—

$$R = 2{\cdot}45\ A \times 10^{6} \qquad \text{……………………(2)}$$

Where A is expressed in grams/metric ton. Using this relationship, Erickson estimated the ratio of the potential resources for several useful metals to the known reserves, for U.S.A. as well as for the world (Table 1).

Table 1 : Ratio of potential resources to known reserves (after Erickson).

Elements	*World*	*U.S.A.*
Lead	10	1.0
Molybdenum	23	1.0
Copper	10	1.6
Silver	18	3.2
Gold	14	4.1
Zinc	42	6.3
Uranium	112	20.0
Nickel	38	830.0

It is to be emphasised that the calculated resource potential as above, represents resources recoverable under present economic conditions. Resources of group (c) are excluded.

Erickson (1972) also showed that the potential recoverable resources of individual elements in U.S.A. closely approaches the 0.01 per cent of the total amount of that particular element available in the U.S.A. crust to 1 km. depth.

India's Potential Mineral Resources

An attempt has been made by Lahiri (1975) to estimate the potential recoverable resources of India in respect with certain metals on the lines of Erickson's methods, namely, (a) based on the mean crustal abundance of these elements in the Indian continental crust, and (b) based on the total content of these elements upto 1 km. depth in India (Table 2).

Table 2 : India's Potential Mineral Resources (after Lahiri, 1975).

Element 1	*Crustal abundance in g/tonne** 2	*Potential Resources† (10^6 tonnes)* 3	*Metal-content of known reserves for India (10^6 tonnes)* 4	*Potential Resources to Reserves* 5	*Metal content upto 1 km depth under India (10^6 tonnes)* 6	*0.01% of column 6 (10^6 tonnes)* 7
Copper	51.4	45.5	3.5	13	470.0	47.0
Lead	13.0	11.9	3.1	4	119.0	11.9
Zinc	82.4	73.8	3.8	19	754.0	75.4
Iron	44,500.0	44,014.0	4,974.0	9	407,000.0	40,7000.0
Manganese	1,083.0	914.0	42.7	21	9910.0	991.0
Tin	1.5	1.4	—	very high	14.0	1.4

* Mean crustal abundance assuming a ratio of shield area : folded belt=9 : 1 (cf. Lee and Yao, 1970).

† Weight of Indian continental crust taken as $0{\cdot}336 \times 10^{18}$ tonnes (average crustal depth of 36.5 km and specific gravity of 2.8).

It must be noted that the estimates of potential resources are based on many simplifying assumptions and they give only the order of magnitude.

The values in column 5 of Table 2 when compared with those in Table 1 for U.S.A. indicate that there is scope for very intensive exploration efforts in India, so that the ratios of potential resources to reserves should approach those in the U.S.A. There is ample scope for new discoveries in India of many mineral deposits of the ores of copper, lead, zinc, tin, iron and manganese, and indeed of many other minerals. Also with improvements in technology as well as with increase of price (consequent on growing demand), lower grade mineral deposits which at present are not economically workable would be added to the category of reserves. Mineral resources under the oceans around India would also add to her reserves.

There is thus, no room for discouragement regarding availability of mineral resources in India in the foreseeable future, provided we harness our energies in order to explore for them. Conventional geological techniques would not perhaps be very effective in this regard. The Indian earth scientists, in collaboration with engineers, statisticians and others will have to develop and apply new and more effective techniques for locating and assessing mineral deposits.

REFERENCES

Erickson, R. L. (1972) : *Crustal Abundance of Elements and Minerals Reserves and Resources. U. S. Geog. Survey Pref. Paper 820.*

Lahiri, A. (1975) : *A Long-range Perspective for India : Minerals and Metals : 2000 A D. Operations Research Group, Baroda.*

McKelvey, V. E. (1960) : *Mineral Resources Estimates and Public Policy. Amer. Scientist V.60, pp. 32-40.*

Confessions of an Editor

Shankar Nath Sen

At the outset it must be confessed that the *Presidency College Patrika* has thinned down considerably. This slimming may be attributed to various reasons. First of all the present publication is not a special number like the Diamond Jubilee Issue of last year ; therefore, the present number was barred from enjoying any fiscal grant. Besides, the economic embarrassment, along with the problem of soaring prices of the materials required for printing has compelled the magazine to reduce itself.

In spite of repeated requests, the authority seems to show utter indifference about the increase in the Mazazine Fee. It would be a jolly good idea, if professors and ex-students also contributed something, since they are as much interested as the present students, in having their writings published in this journal. This would reduce the pecuniary difficulties to some extent. The atrocious idea of inserting advertisements in the college magazine is abomnible, since the editorial board cannot restrict the publication of obscene advertisements and lackadaisical wordings. To add to this, there would be the efforts of the printer to insert gorgeous typographical ornamentations to make the advertisements gaudy. Such things will surely degenerate the reputable journal to a trashy commercial brochure controlled by big business magnates. But then the idea of fixing a price for each number and selling it outside the college, to the interested public and ex-students, will be benefical·in the long run. The increase in funds may give an opportunity for special numbers centred on certain aspects and make room for serial publications of the relatively longer articles. If such a policy is implemented, the magazine may have some sort of periodical frequency in its publication.

Quite a few readers may be bullied by the intellectual stalwarts to nurture the obnoxious notion that the standard of the college magazine has gone down. But that is not the case. It is true that the present number is lacking in scholastic treatises prepared by professors and past students ; but this does not in any way prove that the quality of the magazine has deteriorated. General students are led to believe that the college magazine is meant to be a rich treasure-trove of rare intellectualism. They are afraid to write on simple things such as mountains, rivers, trees, or flowers, lest they should be ridiculed by the soil-cuffed intellectuals.

The editorial board should not lose sight of the fact that the college magazine is meant to be a mouthpiece of the general students. It goes without saying that, the actual intellectual accumen of the college is reflected through the writings of the students published in the college magazine. But the common reader is shocked to find that the intelligentsia belonging to the present student generation of Presidency College has bowed out, to yield place to their revered teachers and ex-students. When the writings of the professors and students are put on the same anvil, obviously the writings of the humble students stand no chance. A large number of students make an attempt at writing versatile discourses tagged with pendatic footnotes and recondite references ; they usually end up in a futile mess. The long cherished desire of many a budding author is throttled by such a convention. By giving priority in the matter of selection to contribution from students the traditional sobriety and dignity of the time-honoured journal has not by any means been sacrificed. Nevertheless, the policy we have adopted has come through rather successfully. The policy initiated will surely give ample scope to the students in future to take an active interest in the college magazine. I earnestly hope the magazine (if not the policy) will be welcome to all.

The unavoidable delay in the publication of the previous special number had to some extent delayed the present issue. Moreover, certain unfortunate incidents leading to the arrest of several students from the Principal's office, the resignation of the Students' Union which culminated in the removal of the Principal from office—are also responsible for this delay. The existing bureacratic paraphernalia is culpable for retarding the activities of the editorial board from time to time. For each little decision, we had to undergo several bouts of indecisive meetings and drowsy discussions.

• • • • • •

I take upon myself the melancholy duty of noticing the deaths of several of our illustrious ex-students—Debendra Mohan Bose, the eminent scientist ; Promotho Nath Banerjee, the first editor of this magazine ; and Kuladaranjan Kar, the renowned physicist. We offer our respectful homage to the memory of Professor Chandika Prosad Banerjee, the Head of the Department of History. Since we went to press, Surajit Lahiri, the Ex-Chief Justice of the Calcutta High Court, passed away.

Finally, I would like to thank Professor Ajoy Banerjee, for his invaluable suggestions and guidance. My thanks are also due to Shri Shantanu Mitra, who had assisted me in the initial stage. I convey my sincerest thanks to the students of the college without whose advice, criticism, encouragement and co-operation, this publication would have never appeared. Shri Suprio Halder deserves a big thank you for his help. I acknowledge my debt to them humbly, gratefully and sincerely.

Index

Prabodh Krishna Biswas

Author's Name	Title	Volume	Page
Anonymous	Presidency College 1955-1974	L I	95
Bagchi, Jasodhara	Professor Amal Bhattacharji : A Tribute	XLIX	22
Banerjee, Anil Chandr	Memories of Old Days	L I	29
Banerjee, Arupratana	Metamorphosis of an Indian Godfather	L I	117
Banerjee, Gouri	The Philosophers' Stone	XLVII	31
Basu, Gautam	Modern Political Poetry : An Achievement in Synthesis	L I	86
—do—	The Inaudible Voice of Black Orpheus	LII	1
Bhattacharjee, Amal	Rabindranath	L	10
Bhattacharji, Saumyendra	Presidency College : A Fresher's Impression	XLVII	49
Bhattacharya, Kavery	The Dawn of Hope	LII	38
Bose, Gautam	On Mathematics & Mathematicians	LII	13
Chakraborti, Debasish	U. S. A. in Vietnam : An Appraisal	XLVII	1
Chakraborti, Hiren	Notes on Yours Affectionately, K. Zachariah	L	50
Chakraborti, Sirshendu	The Role of Death in Antony & Cleopatra	L	25
Chakraborty, Arindam	The Paradox of Definition	L I	122
Chakraborty, Dhruba Jyoti	The Indian Ocean : A Zone of Peace	LII	19
Chakraborty, Kalyan Kr.	Rodiu, the Sculptor	XLVII	19
Chakraborty, Phani Bhushan	Teaching of English in Presidency College in My Time	L I	9
Chatterjee, Kalyan	Bertrand Russel : A Hero of the Twentieth Century	XLIX	64
—do—	Scientific Knowledge & Reality	L I	58
Chatterjee, Lopamudra	A Note on Vaughan's The Retreat	L I	89
Chaudhuri, Sukanta	Gerald Manley Hopkins	XLVII	39
—do—	T.S. Eliot:Tradition & the Individual Critic	XLIX	44
—do—	Leonardo & the Dream of Wisdom	L I	74

Chowdhury, Arun Shankar	Tradition, An Enigma ?	XLIX	105
Das, Sumit Ranjan	Science, Illusion and Reality	L	31
—do—	The Copernican Revolution Reviewed	L I	65
—do—	On the Materialist Historiography of Science	LII	30
Das, Suranjan	Ninteenth Century Bengal : A Profile	L I	118
Das Gupta, Arun Kumar	Time, Helen & Cleopatra	L I	80
Das Gupta, Subho Ranjan	For a Poem	XLVII	30
Das Gupta, Supriya	A Criticism of the Age	L	21
De, Bishnu	Prof. S. N. Bose : A Personal Tribute	L	55
Dustoor, F. E.	College Memoirs and Portraits	L I	4
Gangopadhaya, Debasish	Revolution in an Age of Imperialism & Social Imperialism	L I	114
Ganguly, Sipra	Civilization—its Origins & Constituents	L	41
Ghatak, Kamal Kumar	The Hindu Critics of Rammohan	XLIX	59
Goon, Atindra Mohan	The Statistics of Birth	L I	48
	The Statistics of Death	L	13
	Professor P. C. Mahalanobish	XLIX	16
Kundu, Sudakshina	The Heritage of Indian Art	LII	39
Lal, Ananda	Of You & I : Variation on a Theme	LII	24
Mitra, Jayanta	Speculations on an Empty Stage	XLIX	74
Mokherjee, Jatil Kumar	Jalpa or Disputation	L I	128
Mukherji, Nilmoni	Notes on Yours Affectionately, K. Zachariah	L	50
Mukherjee, Rudrangshu	An Essay Towards a Reassessment of Aurangzeb	XLIX	79
Patitundi, Barindranath	Colour & Chemical Constitution	XLVII	62
Paul, Paramananda	Wither Our Democracy	XLVII	20
Raha, Amit	The Role of Agriculture in Indian Economic Development	XLVII	26
Ray Samar, S. Mukherjee	The Philosophy of History	XLVII	52
Saha, A. K.	Estimating India's Potential Mineral Resources	LII	43
Sanyal, Pradip Kumar	The Need to Promote Forestry in India	LII	10
Sarkar, Tanika	The Concept of Muslim Tyranny : An Unbroken Tradition	XLIX	89
Sen, Asok	The Hinderance of Bureaucracy	XLIX	98
Sen Gupta, Nirmal Chandra	My College Days	L I	34
Sen Gupta, Subodh Chandra	Dr. Srikumar Banerjee : A Personal Memoir	XLIX	8
Sinha, Anup	The Third World	XLIX	52
Sinha, Nirmal Chandra	The Simla Convention, 1914 : A Chinese Puzzle	L I	36
Zachariah, Kuruvilla	The Political Theory of Imperialism	XLIX	26
—do—	Yours Affectionately	L	1

Our Contributors

Ananda Lal

A student of 3rd year English who loves to stage and act in dramas which are generally inaudible beyond the proscenium. But then, he has never had reason to accuse our acoustics experts of not helping. On other stages he is reputed to be exasperatingly brilliant.

A. K. Saha

Professor of Geology Department.

Dhruba Jyoti Chakraborty

Student of 3rd year (outgoing) History. If the amnesia he suffers whenever it comes to remembering the concept of sound pollution be the secret of his success, then success may well remain a secret to us. One wonders where his appearence would least disturb the eye—in a classroom or in a government brochure on Happy Planned Families.

Gautam Basu

Student of 3rd year (outgoing) Economics. Trying his hardest to learn the ropes ; edits an absurdly high-priced, fashionably thin poetry journal ; has slimmed himself : expects that his anomalous beard will do the rest.

Gautam Bose

Student of 3rd year Mathematics. Seldom seen outside classrooms and quiz teams. The last time we were lucky, we caught him just inside the college gates whishing David Hare 'Good morning'.

Kavery Bhattacharya

Presently a post-graduate student of English at Jadavpur University. In college opinions are divided about her. To some she is a lady in love with her own voice and a culture. Others regard her as an anthropological phenomenon who habitually pronounces two words in as many minutes with consummate ease.

Prabodh Krishna Biswas

Assitant Librabrian of the Arts Section.

Pradip Kumar Sanyal

A student of 2nd year Economics writing on forestry. He could do with a voice and a figure to match the breadth of his interest.

Sudakshina Kundu

Student of 3rd year Physics. If Mary of 'Mary had a little lamb' were a surrealist painter or Melba wore pigtails they still would not have been Sudakshina Kundu.

Sumit Ranjan Das

Student of 3rd year (outgoing) Physics. Precocious little wizard on a life-long mission of examining how true scientific truth is.

Past Editors and Secretaries

EDITORS	YEAR	SECRETARIES
Pramatha Nath Banerjee	1914-15	Jogesh Chandra Chakravarti
Mohit Kumar Sen Gupta	1915-17	Prafulla Kumar Sircar
Saroj Kumar Das	1917-18	Ramaprasad Mukhopadhyay
Amiya Kumar Sen	1918-19	Mahmood Hasan
Mahmood Hasan	1919-20	Paran Chandra Gangooli
Phiroze E. Dastoor	1920-21	Shyama Prasad Mookerjee
Shyama Prasad Mookerjee	1921-22	Bimal Kumar Bhattacharjya
Brajakanta Guha		Uma Prasad Mookerjee
Uma Prasad Mookerjee	1922-23	Akshay Kumar Sirkar
Subodh Chandra Sen Gupta	1923-24	Bimala Prasad Mukherjee
Subodh Chandra Sen Gupta	1924-25	Bijoy Lal Lahiri
Asit K. Mukherjee	1925-26	
Humayun Kabir	1926-27	Lokes Chandra Guha Roy
Hirendranath Mukherjee	1927-28	Sunit Kumar Indra
Sunit Kumar Indra	1928-29	Syed Mahbub Murshed
Taraknath Sen	1929-30	Ajit Nath Roy
Bhabatosh Dutta	1930-31	Ajit Nath Roy
Ajit Nath Roy	1931-32	Nirmal Kumar Bhattacharjee

EDITORS	YEAR	SECRETARIES
Sachindra Kumar Majumdar	1932-33	Nirmal Kumar Bhattacharjee
Nikhilnath Chakravarty	1933-34	Girindra Nath Chakravarti
Ardhendu Baksi	1934-35	Sudhir Kumar Ghosh
Kalidas Lahiri	1935-36	Prabhat Kumar Sircar
Asok Mitra	1936-37	Arun Kumar Chandra
Bimal Chandra Sinha	1937-38	Ram Chandra Mukherjee
Pratap Chandra Sen Nirmal Chandra Sen Gupta	1938-39	Abu Sayeed Chowdhury
A Q. M. Mahiuddin	1939-40	Bimal Chandra Dutta
Manilal Banerjee	1940-41	Prabhat Prasun Modak
Arun Banerjee	1941-42	Golam Karim
There was no Publication	1942-46	Due to Paper Economy
Sudhindranath Gupta	1947-48	Nirmal Kumar Sarkar
Subir Kumar Sen	1948-49	Bangendu Gangopadhyay
Dilip Kumar Kar	1949-50	Sourindramohan Chakravarti
Kamal Kumar Ghatak	1950-51	Manas Mukutmani
Sipra Sarkar	1951-52	Kalyan Kumar Das Gupta
Arun Kumar Das Gupta	1952-53	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
Ashin Ranjan Das Gupta	1953 54	Pradip Das
Sukhamoy Chakravorty	1954-55	Pradip Ranjan Sarbhadhikari
Amiya Kumar Sen	1955-56	Devendra Nath Banerjee
Asoke Kumar Chatterjee	1956-57	Subal Das Gupta
Asoke Sanjay Guha	1957-58	Debaki Nandan Mondal
Ketaki Kushari	1958-59	Tapan Kumar Lahiri
Gayatri Chakravarty	1959-60	Rupendu Majumdar
Tapan Kumar Chakravarty	1960-61	Ashim Chatterjee
Gautam Chakravarty	1961-62	Ajoy Kumar Banerjee
Badal Mukherji Mihir Bhattacharya	1962-63	Alok Kumar Mukherjee
Pranab Kumar Chatterjee	1963-64	Pritis Nandy
Subhas Basu	1964-65	Biswanath Maity
No Publication	1965-66	
Sanjay Kshetry	1966-67	Gautam Bhadra
No Publication	1967-68	
Abhijit Sen	1968-69	Rebanta Ghosh
No Publication	1969-72	No Union Election
Anup Kumar Sinha	1972-73	Rudrangshu Mukherjee
Rudrangshu Mukherjee	1973-74	Swapan Chakravorty
Swapan Chakravorty	1974-75	Suranjan Das
Shankar Nath Sen	1975-76	Union Resigned